গণিতাঙ্ক

শাহরিয়ার কবির

ওয়েসমার্ক ই-পাবলিকেশন

গণিতাঙ্ক

শাহরিয়ার কবির

ওয়েমার্ক ই-পাবলিকেশন

গ্রন্থস্বত্ব © বিভিন্ন ওয়েবসাইট

ই-বুক প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০২০

সম্পাদনা : জামিল হাসান নাঈম

প্রচ্ছদ : জামিল হাসান নাঈম

ই-বুক কারিগরি : জামিল হাসান নাইম

প্রকাশক : **ওয়েমার্ক ই-পাবলিকেশন**

Email : **waymarkepublication@gmail.com**

এই ই-বুক শুধুমাত্র পাঠকের বই পড়ার অভ্যেস গড়ার জন্য এবং যে কেউ বিনামূল্যে বিতরণ করতে পারবে। লেখকের অনুমতি ব্যতীত বইটি বিক্রির উদ্দেশ্যে মুদ্রণ এবং যেকোন ওয়েব ও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে ব্যবহার নিষিদ্ধ। বইয়ের সকল লেখার দায়দায়িত্ব লেখকের।

ভূমিকা

বইটিতে গণিতের ইতিহাস এবং গণিতের বিভিন্ন পদ্ধতির উৎপত্তিকাল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গণিতের মজাদার বেশকিছু কৌশল এবং বিভিন্ন অবাক করা সংখ্যা/নিয়ম বইটিতে স্থান পেছে। গণিত বিষয়ে আগ্রহী তরুণ সমাজের জন্য ***"শাহরিয়ার কবির"*** ইন্টারনেটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন উৎস হতে গণিতের এইসব তথ্য সংগ্রহ করে তা বই আকারে তুলে দিয়েছেন পাঠক সম্প্রদায়ের হাতে।

এই বইয়ে ব্যাবহৃত তথ্যের উৎসসমূহঃ

- গনিত শাস্ত্রের ইতিহাস
- উইকিপিডিয়া
- MagthEmagic
- mathisfun.com
- বর্গমুল (ওয়েব)

√গণিতাঙ্ক

সূচিপত্র

গনিতের ইতিহাস	৬
গনিতের ভিত্তি	৭
সংখ্যা আবিষ্কার	১১
মজার সংখ্যা - ৩৭০৩৭	১৭
বেজোড়ের বর্গ	১৮
মজার বিন্যাস	১৯
৯ এর কান্ড কারখানা	২০
আবারো ৯ এর গুনে মজার সংখ্যা	২২
৯ এর ভাগে লবের সংখ্যা	২৩
π এর অজানা তথ্য	২৪
সংখ্যার রাজা ১	২৮
শূন্য	২৯
আধ্যাত্মিক সংখ্যা ৮	৩৯
মজার সংখ্যা ১৩২	৪১
মজার সংখ্যা ১৬৯	৪১
৬ থেকে ৯	৪২
৭ এর গুনে মজার সংখ্যা	৪২
৮ এর একটি অদ্ভুদ জাদু	৪৩
৩ এর ম্যাজিক	৪৪
প্যালিনড্রমিক সংখ্যা	৪৫
১ এর গুনে প্যালিনড্রমিক সংখ্যা	৫১
মৌলিক সংখ্যা	৫২
ম্যাট্রিক্স	৫৪
প্যাসকেলের ত্রিভুজ	৫৮
শূন্যের ইতিহাস	৫৯
সোনালী অনুপাত	৬০
৪৬৪ এর অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য	৬৩
অদ্ভুত সংখ্যা ৭৬৯২৩ (পর্ব-১)	৬৩
অদ্ভুত সংখ্যা ৭৬৯২৩ (পর্ব-২)	৬৪
অদ্ভুত সংখ্যা ১৪২৮৫৭ (পর্ব-৩)	৬৪
১৯ এর কারসাজি	৬৫
৯১০৯ এর জটিল রহস্য	৬৬
যোগফল থেকে বর্গ	৬৭
ঘন ও বর্গের সম্পর্ক	৬৮
ম্যাজিক ফ্যাক্টোরিয়াল	৬৯
১০৮৯ এর রহস্য	৭০
১ এর সাম্রাজ্য	৭১
৮ এর সাম্রাজ্য	৭২
১ + ১ = ২ প্রমাণিত	৭৩
০ ÷ ০ = ২ প্রমাণ	৭৪
রহস্যময় ৬১৭৪	৭৫
০.৯৯৯৯... থেকে ১	৮২
মার্জেন মৌলিক	৮৩
e এর চমক	৮৪
জটিল সংখ্যা	৮৫
অমুলদ সংখ্যা	৮৮
বিস্ময়কর মৌলিক সংখ্যা	৮৯
ট্রানকেটেবল প্রাইম	৯১
টু সাইডেড প্রাইম সংখ্যা	৯৩
গণিতের কালপঞ্জি	৯৫
১০ জন গনিতবিদ	৯৭

গনিতের ইতিহাস

গণিত পরিমাণ, সংগঠন, পরিবর্তন ও স্থান বিষয়ক গবেষণা। গণিতে সংখ্যা ও অন্যান্য পরিমাপযোগ্য রাশিসমূহের মধ্যকার সম্পর্ক বর্ণনা করা হয় । গণিতবিদগন বিশৃঙ্খল ও অসমাধানযুক্ত সমস্যাকে শৃঙ্খলভাবে উপস্থাপনের প্রক্রিয়া খুঁজে বেড়ান ও তা সমাধানে নতুন ধারণা প্রদান করে থাকেন । গাণিতিক প্রমাণের মাধ্যমে এই ধারণাগুলির সত্যতা যাচাই করা হয় । গাণিতিক সমস্যা সমাধান সম্পর্কিত গবেষণায় বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ বা শত শত বছর পর্যন্ত লেগে যেতে পারে ।

গণিতের সার্বজনীন ভাষা ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা একে অপরের সাথে ধারণার আদান-প্রদান করেন । গণিত তাই বিজ্ঞানের ভাষা । ১৭'শ শতক পর্যন্তও কেবল পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতিকে গাণিতিক শাস্ত্র হিসেবে গণ্য করা হত। সেসময় গণিত দর্শন ও বিজ্ঞানের চেয়ে কোন পৃথক শাস্ত্র ছিল না। আধুনিক যুগে এসে গণিত বলতে যা বোঝায়, তার গোড়াপত্তন করেন প্রাচীন গ্রিকেরা, পরে মুসলমান পণ্ডিতেরা এগুলি সংরক্ষণ করেন, অনেক গবেষনা করেন এবং খ্রিস্টান পুরোহিতেরা মধ্যযুগে এগুলি ধরে রাখেন । তবে এর সমান্তরালে ভারতে এবং চীন-জাপানেও প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগে স্বতন্ত্রভাবে উচ্চমানের গণিতচর্চা করা হত। ভারতীয় গণিত প্রাথমিক ইসলামী গণিতের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

১৭'শ শতকে এসে আইজাক নিউটন ও গটফ্রিড লাইবনিৎসের ক্যালকুলাস উদ্ভাবন এবং ১৮'শ শতকে অগুস্তঁ লুই কোশি ও তাঁর সমসাময়িক গণিতবিদদের উদ্ভাবিত কঠোর গাণিতিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিগুলির উদ্ভাবন গণিতকে একটি একক, স্বকীয় শাস্ত্রে পরিণত করে। তবে ১৯'শ শতক পর্যন্তও কেবল পদার্থবিজ্ঞানী, রসায়নবিদ ও প্রকৌশলীরাই গণিত ব্যবহার করতেন।

১৯'শ শতকের শুরুতে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের যে আধুনিক ধারা সূচিত হয়, সে-সংক্রান্ত গবেষণাগুলির ফলাফল প্রকাশের জন্য জটিল গাণিতিক মডেল উদ্ভাবন করা হয়। বিশুদ্ধ গণিতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণায় জোয়ার আসে। অন্যদিকে ২০'শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কম্পিউটারের আবিষ্কার এ-সংক্রান্ত সাংখ্যিক পদ্ধতিগুলির গবেষণা বৃদ্ধি করে ।

গনিতের ভিত্তি

গণিতের ভিত্তি (ইংরেজি: Foundations of mathematics) বলতে গণিতের সেই শাখাকে বোঝায় যেখানে প্রাথমিক গাণিতিক ধারণাসমূহকে ।
(যেমন - সংখ্যা, পরিমাণ, আকৃতি, সেট, ইত্যাদি) কিছু মৌলিক ধারণার স্তরক্রমে (hierarchy of fundamental concepts) বিন্যস্ত করা হয়, কী ভাবে স্বতঃসিদ্ধ নির্মাণ ও গাণিতিক প্রমাণ সম্পাদন করতে হয়, তার নিয়মগুলো খুঁজে বের করা হয়, এবং এগুলো যে বিধিগত ব্যবস্থার (formal system) অন্তর্গত, তার বৈশিষ্ট্য ও সীমা নিয়ে আলোচনা করা হয় । বর্তমান গণিতের কিছু শাখা, যেমন - গাণিতিক যুক্তিবিজ্ঞান, স্বতঃসিদ্ধমূলক সেট তত্ত্ব, প্রমাণ তত্ত্ব, মডেল তত্ত্ব, পুনরাবৃত্তি তত্ত্ব (recursion theory) ইত্যাদিকে একত্রে "গণিতের ভিত্তি" নামে ডাকা হয় ।

ইতিহাসঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে গণিতে সেটের ধারণা নিয়ে কাজ শুরু হয়। বর্তমানে সেট গণিতের অন্যতম মৌলিক ও কার্যকরী ধারণা হিসেবে প্রমাণিত। তবে একই সাথে সেটের ধারণা কিছু সুপরিচিত কূটাভাসের (paradox) জন্ম দিয়েছে ।

সেটের ধারণার উপর ভিত্তি করে রিচার্ড ডেডেকিন্ড স্বাভাবিক সংখ্যা ও বাস্তব সংখ্যার তত্ত্ব প্রদান করেন। বাস্তব সংখ্যাকে তিনি মূলদ সংখ্যার সেটের খন্ডাংশ বা "cuts" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন। এভাবে সেট তত্ত্ব গণিতের একটি ঐক্যবদ্ধকরণের নীতি (unifying principle) হিসেবে কাজ করত ।
কিন্তু দেখা গেল সেট তত্ত্বে অতি ব্যবহৃত কিছু যুক্তি (argument) কূটাভাসের জন্ম দেয়। অথচ এই যুক্তিগুলোই গণিতের সবচেয়ে কার্যকর যুক্তিগুলোর অন্যতম এবং বিধিগত যুক্তিবিজ্ঞানের (formal logic) একেবারে প্রাথমিক কাঠামো এদের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে । এই পর্যবেক্ষণের ফলস্বরূপ অনেক সমালোচক গণিতবিদ গাণিতিক যুক্তিপ্রদানের প্রকৃতি নিয়েই প্রশ্ন তোলেন । আর সেই প্রশ্নের

উত্তর খুঁজতে গিয়েই বিংশ শতাব্দীর শুরুতে গণিতের এক নতুন শাখার সৃষ্টি হয়, যার নাম দেয়া হয় গণিতের ভিত্তি (foundations of mathematics) । সৃষ্টির শুরুতেই শাখাটি বিভিন্ন মতবাদে (doctrines) বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে বারট্রান্ড রাসেলের যুক্তিবাদ (logicism), ব্রাউয়ারের স্বজ্ঞাবাদ (intuitionism) এবং হিলবার্টের বিধিবাদ (formalism) অন্যতম। যে সেট তত্ত্বের কারণে এই গোলযোগের শুরু, তাতে সংশোধন এনে বলা হল গেয়র্গ কান্টরের প্রদত্ত সেটের সংজ্ঞা অতিরিক্ত সরল (naive), এবং স্বতঃসিদ্ধের (axioms) ভিত্তিতে তত্ত্বটি নতুন করে বর্ণনা করার প্রয়াস নেয়া হল। যারমেলো-ফ্রাঙ্কেলের সেট তত্ত্ব এদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ।
ব্রাউয়ারের স্বজ্ঞাবাদ সম্প্রতি কমপিউটার প্রোগ্রামিং-এর প্রেক্ষাপটে ব্যবহারিক গুরুত্ব লাভ করেছে।

যুক্তিবাদঃ

রাসেল বললেন যে গণিত যুক্তিবিজ্ঞানের একটি শাখা এবং ধারণাসমূহের প্রকার বা "type" অগ্রাহ্য করার ফলে কূটাভাসের সৃষ্টি হয় । তিনি গাণিতিক ধারণাগুলোকে এমনভাবে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করার চেষ্টা করেন যাতে কোন ধারণার সংজ্ঞায় ঐ ধারণাটিকেই আবার ব্যবহার করার প্রয়োজন না পড়ে এবং যুক্তির দুষ্টচক্র সৃষ্টি না হতে পারে । তার মতে গণিতে বিধিবদ্ধভাবে গঠনসমূহ আলোচনা করা হয় এবং এই আলোচনা গঠনগুলোর বাস্তব অর্থ (concrete meaning) থেকে স্বাধীন । আদিকাল থেকেই এই ধরনের বিজ্ঞানের নাম দেয়া হয়েছে যুক্তিবিজ্ঞান । রাসেলের মতে যুক্তিবিজ্ঞান হল গণিতের যৌবন, আর গণিত হল যুক্তিবিজ্ঞানের পূর্ণবয়স্ক রূপ । রাসেল আরও বললেন যে, এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গণিত নির্মাণ করতে হলে মানুষের মুখের স্বাভাবিক ভাষা দিয়ে কাজ হবে না, কেন না তা দীর্ঘ ও ত্রুটিপূর্ণ । গণিতের জন্য প্রয়োজন বিশেষ ধরনের প্রতীক ব্যবস্থা । রাসেল তাই প্রতীকী যুক্তিবিজ্ঞান (symbolic logic) ব্যবহার করে গণিত পুনর্গঠন করতে চেষ্টা করলেন। তবে এ ক্ষেত্রে রাসেল প্রথম ব্যক্তি ছিলেন না।

রাসেলের আগে গটফ্রিড লাইবনিৎস তার Dissertatio de arte combinatoria (১৬৬৬) গ্রন্থে, অগাস্টাস ডি মর্গান, জর্জ বুল, চার্লস স্যান্ডার্স পেয়ার্স, শ্র্যোডার, গট্‌লব ফ্রেগে, পেয়ানো, ও আরও অনেকে যুক্তিবৈজ্ঞানিক চিহ্ন ব্যবহার করে গণিত পুনর্বিন্যাস করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে ফ্রেগে ও পেয়ানোর ব্যবহৃত প্রতীকগুলোই বর্তমান কালের গণিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। রাসেল তার আগের এই সমস্ত কাজ অধ্যয়ন করেন এবং এ সম্পর্কে তার নিজের তত্ত্ব হোয়াইটহেডের সাথে একসাথে তিন খণ্ডের এক বিশাল গ্রন্থে প্রকাশ করেন, যে গ্রন্থের নাম প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেম্যাটিকা (প্রথম সংস্করণ ১৯১০-১৯১৩)। এ গ্রন্থে যুক্তিবিজ্ঞানের মৌলিক বিধিসমূহ ব্যবহার করে স্বাভাবিক সংখ্যা, বাস্তব সংখ্যা এবং বিশ্লেষণী জ্যামিতির তত্ত্বগুলো পুনঃনির্মাণ করা হয়।

যদি রাসেল ও হোয়াইটহেডের এই কাজ সম্পূর্ণ সফল হত, তাহলে এটি গণিতে কূটাভাসের আবির্ভাব সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে সক্ষম হত। কিন্তু লেখকদ্বয় গণিত নির্মাণ করতে গিয়ে এমন একটি স্বতঃসিদ্ধের আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন যেটি সন্তোষজনক ছিল না (unsatifactory)। তারা প্রকার বা টাইপের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বললেন কোন সেট তার উপাদানগুলো যে টাইপের অন্তর্গত, তার চেয়ে উচ্চতর টাইপের অন্তর্ভুক্ত। এর ফলে কিছু কূটাভাস দূর হলেও অন্য ধরনের সমস্যা দেখা দিল। যেমন মূলদ সংখ্যার তত্ত্ব থেকে বাস্তব সংখ্যার তত্ত্ব তৈরি করতে গিয়ে দেখা গেল বাস্তব সংখ্যার তত্ত্ব অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে। এই জটিলতা নিরসন করতে গিয়ে রাসেল axiom of reducibility প্রস্তাব করলেন, কিন্তু তিনি নিজেই এই স্বতঃসিদ্ধটি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। এছাড়া রাসেলের প্রস্তাবিত axiom of infinity এবং axiom of choice ও সমস্যাসঙ্কুল প্রতিভাত হয়। যাই হোক, এই বইয়ে উল্লিখিত যুক্তিবিজ্ঞান ও এই বইয়ের ওপর ভিত্তি করে করে র‍্যামসের উদ্ভাবিত টাইপ তত্ত্ব এখনও গণিতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

স্বজ্ঞাবাদঃ

স্বজ্ঞাবাদীদের মতে গাণিতিক বস্তু বা সত্যসমূহ গাণিতিক চিন্তাভাবনাকারী ব্যক্তি বা গাণিতিক স্বজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তির থেকে স্বাধীন নয়। এই বস্তু বা সত্যগুলো কেবল গাণিতিক মনের সাহায্যেই উপলব্ধি করতে হয়। ১৯ শতকে ক্রনেকার ও পোয়াঁকারে, ২০ শতকের শুরুতে বোরেল, লেবেসগে, ও লুজিনের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বজ্ঞাবাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তবে শেষোক্ত তিন জনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রায়-স্বজ্ঞাবাদ (semi-intuitionism) বা ফরাসি অভিজ্ঞতাবাদ (French empiricism) নামেই বেশি পরিচিত। ওলন্দাজ গণিতবিদ ব্রাউয়ার স্বজ্ঞাবাদের আরও সঙ্কীর্ণ একটি অবস্থান গ্রহণ করেন, যা হিলবার্টের বিধিবাদের ঘোর বিরোধী ছিল। বর্তমানে স্বজ্ঞাবাদ বলতে ব্রাউয়ারের ব্যাখ্যাকৃত স্বজ্ঞাবাদকেই বোঝায়।

সংখ্যা আবিষ্কার

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই গণনার প্রয়োজনীয়তা মানুষ উপলব্ধি করেছে। শিকার করা প্রাণীর সংখ্যা কিংবা দ্রব্য বিনিময় যুগে লেনদেনের সুবিধার্থে হিসাব নিকাশের ধারণা অর্জন করা মানুষের জন্য ছিল অপরিহার্য। তবে শুরুর দিকে সংখ্যা নিয়ে মানুষের ধারণা বেশ অস্পষ্ট ছিল। সংখ্যাগুলো সর্বদাই বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকত, যেমন- একটি পাখি, এক জোড়া জানোয়ার, দুটো হাত, এক হাঁড়ি মাছ।

আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার অনেক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাঝে এক-দুশো বছর আগেও সংখ্যা নিয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিলো না । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় দক্ষিণ আফ্রিকার হটেনটট আদিবাসীর কথা। তাদের ভাষায় শুধু এক থেকে চার পর্যন্ত সংখ্যা ছিল এবং চারের চেয়ে বড় সব সংখ্যাই তাদের ভাষায় অনেক ! আবার অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী কামিলারই গোত্রের মানুষ তিনের চেয়ে বড় কোনো সংখ্যা বোঝাতে সেই সংখ্যাকে এক থেকে তিন পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর যোগফল আকারে প্রকাশ করত । যেমন তাদের কাছে মাল মানে এক, বুলান মানে দুই, গুলিবা মানে তিন । তাই চারকে তারা বলত বুলান-বুলান (দুই-দুই) পাঁচকে বুলান-গুলিবা (দুই-তিন) আর ছয়কে (গুলিবা-গুলিবা) ।

এখন প্রশ্ন চলে আসে কামিলারাই গোত্রের ভাষায় একশ কিংবা এক হাজারকে কীভাবে বলা যায় ? খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে হটেনটট কিংবা কামিলারাই গোত্রের গণনা পদ্ধতি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু এতে তাদের কিছুই আসে যায়নি, কারণ একশ পর্যন্ত গণনা করার দরকারই হয়ত তাদের ছিল না। তবে নবপোলীয় যুগে উন্নত সভ্যতাগুলোর বিকাশের সাথে সাথে প্রয়োজন পড়ল আরও উন্নত গণনা পদ্ধতির।

মিশরীয় গণনা পদ্ধতিঃ

মানব সভ্যতা বিকাশের পেছনে মিশরীয়দের অবদান অনস্বীকার্য। প্রাচীন মিশরে ব্যবসা-বাণিজ্য, স্থাপত্য এবং জীবন যাত্রায় প্রভূত উন্নতির সাথে সাথে একটি উন্নত গণনা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। আর সেই প্রয়োজনীয়তা থেকে বিকশিত হয়েছিল মিশরীয় সংখ্যা পদ্ধতি। প্রকান্ড পিরামিডগুলো নির্মাণের সময় হাজার হাজার শ্রমিকের খোরাক এবং বিপুল পরিমাণ নির্মাণ সামগ্রীর পাকা হিসাব রাখতে তারা সংখ্যা প্রতীক ব্যবহার করত। তবে ধারণা করা হয় মিশরীয়দের সংখ্যা পদ্ধতির সূচনা হয়েছিল পিরামিডেরও আগে, খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের দিকে।

মিশরীয় সংখ্যা পদ্ধতিঃ

কিন্তু আমাদের এখনকার মতো ছিল না মিশরীয়দের সেই সংখ্যাপদ্ধতি। সেখানে ছিল না শুন্যের ব্যবহার। বরং ১০ এর বিভিন্ন গুনিতকের জন্য ছিল আলাদা আলাদা প্রতীক। ধরা যাক, মিশরীয় পদ্ধতিতে আমরা ৮৭৩২ লিখতে চাই। এক্ষেত্রে আমাদের ৮ টি ১০০০, ৭টি ১০০, ৩টি ১০ এবং ২টি ১ পাশাপাশি লিখতে হবে। ফলে ৮৭৩২ সংখ্যার প্রাচীন মিশরীয় রূপটি হবে নিচের ছবিটির মতো ।

ব্যাবিলনীয় পদ্ধতিঃ

গণিতশাস্ত্রে ব্যাবিলনীয়দের অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল । একদিকে জ্যামিতি শাস্ত্র বিকাশিত হয়েছিল মিশরে, আর অন্যদিকে পাটিগণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যা বিকাশিত হয়েছিল ব্যাবিলনে । ব্যাবিলনীয় বিজ্ঞানের সুদূরপ্রসারী প্রভাব আজও আমাদের মাঝে বিদ্যমান । বৃত্তকে ৩৬০ ডিগ্রি কোণে বিভক্তকরণ এবং ৬০ মিনিটে ১ ঘন্টা ও ১২ ঘন্টায় ১ দিনের প্রচলন কিন্তু ব্যাবিলনীয়রাই করেছিল অর্থাৎ ব্যাবিলনীয় ১ মিনিট ছিল আমাদের এখনকার ২ মিনিটের সমান। তবে ব্যাবিলনীয়দের অর্জিত জ্ঞানের বেশিরভাগই কালের বিবর্তনের হারিয়ে

গেলেও মৃতপাত্রে অঙ্কিত ও পাথরের ফলকে খোদাই করা লেখা থেকে জানা যায় ব্যাবিলনীয়রা পিথাগোরাসের উপপাদ্য ও দ্বিপদী উপপাদ্য সম্পর্কে অবগত ছিল ।

মিশরীয়দের মতো ব্যাবিলনীয়রাও শুন্যের ব্যবহার জানত না । তবে মিশরীয়দের সাথে ব্যাবিলনীয়দের সংখ্যা পদ্ধতির মূল পার্থক্য হলো- মিশরীয়রা কোনো সংখ্যাকে প্রকাশ করত ১০ এর গুণিতক আকারে অর্থাৎ উপরে যেটা আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি। অন্যদিকে ব্যাবিলনীয়রা সেই কাজটিই করত ৬০ এর গুণিতক আকারে প্রকাশ করে । তাই ব্যাবিলনীয় সংখ্যা পদ্ধতিকে ষাটমূলক পদ্ধতিও বলা হয় । এখানে একটি প্রশ্ন অবধারিতভাবে চলে আসে - ব্যাবিলনীয়দের ৬০ প্রীতির কারণটা কী ? এর কোনো সরাসরি উত্তর পাওয়া যায় না । অনেকগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ব্যাপার এর সাথে জড়িয়ে আছে । প্রথমত, ৬০ হচ্ছে এমন একটি সংখ্যা যেটি ১,২,৩,৪,৫,৬,১০,১২,১৫,২০ এবং ৩০ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। তাই ভগ্নাংশ সংক্রান্ত কোনো সমস্যা সমাধানে ৬০ বেশ কাজের সংখ্যা।

ধরা যাক, একটি ব্যবসায় ৩ জন অংশীদার এমনভাবে চুক্তি করল যে তারা প্রত্যেকে যথাক্রমে মোট লাভের ১/২, ১/৩ এবং ১/৬ অংশ পাবে। তাহলে যদি ৬০ টাকা লাভ হয় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়জন যথাক্রমে ৩০, ২০, ১০ টাকা পাবে। অর্থাৎ লাভ যত টাকাই হোক না কেন, সেটাকে যদি ৬০ এর গুণিতক আকারে প্রকাশ করা হয়, তাহলে হিসাবটা দাঁড়ায় বেশ সোজা। যদি ১০০০ টাকা লাভ হয় (১৬ × ৬০ + ৪০ = ১০০০), তাহলে প্রথমজন পাবে ১৬ টি ৩০ টাকা বা ৪৮০ এবং সাথে বাকি ৪০ টাকার অর্ধেক ২০ টাকা । দ্বিতীয়জন পাবে ১৬ টি ২০ টাকা এবং তৃতীয়জন পাবে ১৬ টি ১০ টাকা এবং প্রথমজন ৪০ টাকা থেকে অর্ধেক টাকা নেবার পর বাকি অর্ধেক টাকা থেকে দুজনই এমন ভাবে ভাগ পাবে যাতে দ্বিতীয়জন তৃতীয়জনের দ্বিগুণ টাকা পায় । খুব সহজেই কোনো গুণ ভাগ করা ছাড়াই হয়ে গেল নির্ভুল বন্টন ।

এখানে একটি জিনিস মনে রাখতে হবে, আমাদের মতো চমৎকার গুণ-ভাগ করার পদ্ধতি সেসময়ে জানা ছিল না । বর্তমানে আমরা যে দশমিক অঙ্কপাতন পদ্ধতিতে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করি, সেটা আবিষ্কৃত হয়েছে ব্যাবিলনের আরও ৩০০০-৩৫০০ বছর পরে ভারতবর্ষে । এছাড়া ব্যাবিলনীয়রা এক সৌর

বৎসরের দৈর্ঘ্য হিসাব করেছিল ৩৬০ দিন, যেটা প্রকৃত দৈর্ঘ্য ৩৬৫ দিনের বেশ কাছাকাছি । তাদের ১২ ঘন্টায় ১ দিন, ৬০ মিনিটে ঘন্টার কথা তো আগেই জেনেছি আমরা । আর এসব কারণে ব্যাবিলনীয়রা ষাটমূলক পদ্ধতিকেই বেছে নিয়েছিল বলে বিজ্ঞজনেরা মনে করেন ।

গ্রীক ও রোমান পদ্ধতিঃ

ব্যাবিলন ও মিশরের মতো গ্রীক ও রোমানরাও শুন্যের ব্যবহার জানত না। এর একটি বড় কারণ গ্রীক ও রোমানরা অনেক ব্যাপারেই তাদের দ্বারা প্রভাবিত । ১০০, ২০০ প্রভৃতি সংখ্যাকে আজকের জামানার মতো এক বা দুইয়ের পিঠে দুই শুন্য এভাবে না লিখে তারা বরং ব্যাবিলন ও মিশরের মতো আলাদা প্রতীক ব্যবহার করত। তবে গ্রীকরা সংখ্যার জন্য কোনো আলাদা প্রতীক উদ্ভাবন করেনি, বরং গ্রীক বর্ণমালার অক্ষরের সাহায্যে তারা সংখ্যা প্রকাশ করত। আর রোমান পদ্ধতিতে সংখ্যা লেখা আজও প্রাথমিক স্কুলগুলোতে শেখানো হয় । তাই সেটা নিয়ে নতুন করে বলাই বাহুল্য ।

গ্রীক সংখ্যার সারণিতে λ (উচ্চারণ ল্যাম্বডা) দ্বারা বোঝানো হত ৩০ এবং β (উচ্চারণ বিটা) দ্বারা বোঝানো হত ২। তাই গ্রীক পদ্ধতিতে ৩২ লিখতে চাইলে আমাদের লিখতে হবে $\lambda\ \beta$ । কিন্তু সমস্যা হলো ১ থেকে ৯৯৯৯ পর্যন্ত সংখ্যা লিখতেই গ্রীকরা ৩৬ টি আলাদা আলাদা অক্ষর ব্যবহার করত। একইভাবে একলক্ষ পর্যন্ত লিখতে ৪৬ টি, দশলক্ষ পর্যন্ত লিখতে ৫৫ এবং এক কোটি পর্যন্ত লিখতে ৬৪ টি আলাদা আলাদা হরফ ব্যবহার করতে হত যেখানে আধুনিক পদ্ধতিতে আমরা পৃথিবীর সকল সংখ্যাকেই ০-৯ এই দশটি প্রতীকের সাহায্যে লিখতে পারি। এতগুলো ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর মনে রাখা একদিকে যেমন দুষ্কর, অন্যদিকে তাদের যোগ,বিয়োগ,গুণ,ভাগ করাও কষ্টসাধ্য ।

রোমানদের পদ্ধতিটি ছিল অনেকটা মিশরীয়দের মতো । যেমন কেউ রোমান পদ্ধতিতে ২০১৭ লিখতে চাইলে তাকে দুটি এক হাজার (M), একটি দশ (X) এবং সাত (VII) পাশাপাশি লিখতে হবে । তাই রোমান পদ্ধতিতে ২০১৭ হল MMXVI .

মায়া সভ্যতার গণনা পদ্ধতিঃ

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেসব সভ্যতার নাম্বার সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করলাম, সেগুলো প্রত্যেকটি প্রত্যেকের সাথে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল অথবা প্রভাবিত হয়েছিল । তবে এই লিস্টের ব্যতিক্রম হলো মায়া সভ্যতা। ল্যাটিন আমেরিকার এই সভ্যতাটি সম্পর্কে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মানুষের জানতে পেরেছে মাত্র ৫০০ বছর আগে । অথচ মায়া সভ্যতার বিকাশকাল আজ থেকে প্রায় পনেরশ বছর আগে । মায়া সভ্যতা সম্পর্কে লোকমুখে অনেক রহস্যময় কাহিনী প্রচলিত থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে ক্যালেন্ডারের জন্য মায়া সভ্যতা সবচেয়ে বেশি পরিচিত । মজার ব্যাপার হল তাদের ক্যালেন্ডারে ২০১২ সালের পর আর কোন সাল ছিল না । এর বাখ্যা অনেকে এইভাবে দিলেন যে মায়ানরা বিশ্বাস করত ২০১২ সালের পর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, যদিও অনেক গবেষক এই মতের সাথে দ্বিমতপোষণ করেছেন। সে যা-ই হোক, মায়া সভ্যতায় সংখ্যা পদ্ধতির বিকাশ ঘটেছিল একদম স্বতন্ত্রভাবে। তাদের সংখ্যাপদ্ধতি ছিল ৫ ভিত্তিক এবং অবাক করা ব্যাপার হলো মায়ারা শুন্যের জন্য আলাদা প্রতীক ব্যবহার করত । শুন্য, এক ও পাঁচ এই তিনটি সংখ্যার জন্য তারা শুধু তারা আলাদা প্রতীক ব্যবহার করত । বাকি সকল সংখ্যাগুলো লিখত এই তিনটি প্রতীক ব্যবহার করে । সেদিক থেকে চিন্তা করলে আধুনিক পদ্ধতির অনেক কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল মায়ানরা । তবে যোগ-বিয়োগের জন্য মায়াদের পদ্ধতিও বিশেষ সুবিধের ছিল না ।

আধুনিক পদ্ধতিঃ

বর্তমানে যে পদ্ধতিতে আমরা সংখ্যা লিখি সেটা প্রাচীন ভারতীয় এবং আরবদের সম্মিলিত অবদানের ফসল । আশুন্য থেকে নয় পর্যন্ত মোট দশটি প্রতীক ব্যবহার করে যেকোনো সংখ্যা লিখতে পারার বর্তমান পদ্ধতিটি ভারতীয়রা আবিষ্কার করেছিল প্রায় ৬০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে । যদিও খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকেই এই পদ্ধতির যাত্রা শুরু হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন, তবে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের আগের কোনো লিপিবদ্ধ প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি ।

সে যা-ই হোক, ব্যবসা বাণিজ্য এবং ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আরবদের আনাগোনা সেই সময় থেকেই ছিল। ভারতীয় পদ্ধতিতে যোগ-বিয়োগের হিসাব সে সময়ে আরবে প্রচলিত সিস্টেমের চেয়ে ছিল অনেক সহজ ও কার্যকরী। এই দারুণ পদ্ধতিটি তাই আরবদের মনে ধরে গেল খুব সহজে। ভারত থেকে শিখে আসা পদ্ধতি আরবরা ছড়িয়ে দিল সারা বিশ্বে। আরবীতে শুন্যকে বলা হয় সিফর। আরব বনিকদের কাছে শেখা শূন্য বা সিফরকে ইতালিয়রা ল্যাটিনে বলত জেপিরো। আর ল্যাটিন জেপিরো থেকেই এসেছে ইংরেজি জিরো শব্দটি। যদিও ইতালিয় বনিকরা জানত ইন্দো-আরবীয় পদ্ধতিতে হিসাব নিকাশ খুব সহজে করা যায়, তারপরও ভিনদেশীদের পদ্ধতি বলে বাণিজ্য ছাড়া আর অন্য কোনো কাজে তারা এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে চাইত না। তবে অচিরেই ইউরোপে জনপ্রিয়তা লাভ করে ইন্দো-আরবীয় পদ্ধতি। আর এই জনপ্রিয়করণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন যে মানুষটি তার নাম লিওনার্দো ফিবোনাচি (১১৭০-১২৫০)। এই ফিবোনাচির নামানুসারেই কিন্তু নামকরণ করা হয়েছে বিখ্যাত ফিবোনাচি সিরিজের, যদিও সংস্কৃত ছন্দ প্রকরণে ফিবোনাচি সিরিজের ব্যবহার বহু শতাব্দী আগে থেকেই ছিল। বলার অপেক্ষা রাখে না ফিবোনাচি সেখান থেকেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন এই ধারাটির প্রতি। সর্বপ্রথম ছন্দ প্রকরণে ফিবোনাচি ধারা ব্যবহার করেন খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের ভারতীয় পন্ডিত পিঙ্গলা। আর এটাই আদ্যবধি জানা ফিবোনাচি সিরিজ ব্যবহারের প্রাচীনতম নজির।

নির্দ্বিধায় বলে দেওয়া যায় মানবসভ্যতার আজকের এই অভাবনীয় উন্নতির পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে যে শাস্ত্রটি তার নাম বিজ্ঞান। গণিতকে বলা হয় বিজ্ঞানের ভাষা।

মজার সংখ্যা - ৩৭০৩৭

‘৩৭০৩৭’ একটি মজার সংখ্যা । কারণ আমরা যদি এটিকে 3 দ্বারা গুণ করি তবে ৬ টি ১ পাবো । এছাড়া ৩ এর গুনিতক দ্বারা গুণ করলে ৬ টি ২, ৬টি ৩ পর্যায়ক্রমে ৬ টি ৯ পর্যন্ত পেতে থাকবো । চলুন দেখে নিই -

৩৭০৩৭ x ৩ x ১ = ১১১১১১
৩৭০৩৭ x ৩ x ২ = ২২২২২২
৩৭০৩৭ x ৩ x ৩ = ৩৩৩৩৩৩
৩৭০৩৭ x ৩ x ৪ = ৪৪৪৪৪৪
৩৭০৩৭ x ৩ x ৫ = ৫৫৫৫৫৫
৩৭০৩৭ x ৩ x ৬ = ৬৬৬৬৬৬
৩৭০৩৭ x ৩ x ৭ = ৭৭৭৭৭৭
৩৭০৩৭ x ৩ x ৮ = ৮৮৮৮৮৮
৩৭০৩৭ x ৩ x ৯ = ৯৯৯৯৯৯

বেজোড়ের বর্গ

বেজোড় সংখ্যা ও বর্গের মধ্যে একটি অসাধারণ মিল রয়েছে। প্রথম দুইটি বেজোড় সংখ্যার যোগফল ২ এর বর্গের সমান। আবার প্রথম তিনটি বেজোড় সংখ্যার যোগফল ৩ এর বর্গের সমান।

১+৩ = ২ফ্র

১+৩+৫ = ৩ফ্র

১+৩+৫+৭ = ৪ফ্র

১+৩+৫+৭+৯ = ৫ফ্র

১+৩+৫+৭+৯+১১ = ৬ফ্র

১+৩+৫+৭+৯+১১+১৩ = ৭ফ্র

১+৩+৫+৭+৯+১১+১৩+১৫ = ৮ফ্র

১+৩+৫+৭+৯+১১+১৩+১৫+১৭ = ৯ফ্র

১+৩+৫+৭+৯+১১+১৩+১৫+১৭+১৯ = ১০ফ্র

এভাবে এটা ইনফিনিটি পর্যন্ত চলতে থাকবে । কিন্তু কখনো শেষ হবে না । অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত বেজোড় সংখ্যা থাকবে ততদিন এই সিরিজ চলতে থাকবে ।

মজার বিন্যাস

গনিতের কতই না রঙ থাকে । মাঝে মাঝে গনিত ও সেজে ওঠে আপন সাজে । যদি তিনটি তিন এর গুনফল এর সাথে তিনটি তিনের যোগফল এর ভাগ দেয়া হয় তবে তিন ই ফিরে আসে । শুধু তিন নয়, ৬ এর বেলায় ৬ এর দ্বিতীয় গুনিতক, ৯ এর বেলায় ৯ এর তৃতীয় গুনিতক পাওয়া যায় । চলুন দেখে আসি গনিতের একটি অসাধারণ সাজ ।

৩×৩×৩ ÷ ৩+৩+৩ = ৩×১

৬×৬×৬ ÷ ৬+৬+৬ = ৬×২

৯×৯×৯ ÷ ৯+৯+৯ = ৯×৩

১২×১২×১২ ÷ ১২+১২+১২ = ১২×৪

১৫×১৫×১৫ ÷ ১৫+১৫+১৫ = ১৫×৫

এভাবে চলতে থাকবে । এর কোন শেষ নেই ।

৯ এর কান্ড কারখানা

গনিত যে কত মজার একটা বিষয় তা সবাই জানে না । জানবে কেমন করে, গনিত তো আমাদের কাছে একটা আতঙ্কের মত । আচ্ছা কেমন হতো যদি গুনফলে শুধু ১ পাওয়া যেতো ? বিষয় টা মজার হতো তাইনা । হ্যাঁ এটা সম্ভব কারণ ১২৩৪৫৬৭৯ সংখ্যাটিকে ৯ দ্বারা গুণ করলে ৯ টি ১ পাওয়া যায় । অনুরূপ ভাবে,

১২৩৪৫৬৭৯ × ৯ × ১ = ১১১ ১১১ ১১১
১২৩৪৫৬৭৯ × ৯ × ২ = ২২২ ২২২ ২২২
১২৩৪৫৬৭৯ × ৯ × ৩ = ৩৩৩ ৩৩৩ ৩৩৩
১২৩৪৫৬৭৯ × ৯ × ৪ = ৪৪৪ ৪৪৪ ৪৪৪
১২৩৪৫৬৭৯ × ৯ × ৫ = ৫৫৫ ৫৫৫ ৫৫৫
১২৩৪৫৬৭৯ × ৯ × ৬ = ৬৬৬ ৬৬৬ ৬৬৬
১২৩৪৫৬৭৯ × ৯ × ৭ = ৭৭৭ ৭৭৭ ৭৭৭
১২৩৪৫৬৭৯ × ৯ × ৮ = ৮৮৮ ৮৮৮ ৮৮৮
১২৩৪৫৬৭৯ × ৯ × ৯ = ৯৯৯ ৯৯৯ ৯৯৯

৯ এর গুনে মজার সংখ্যা

৯ যে কতটা মজার অংক তা আমরা ইতিমধ্যে দেখে ফেলেছি । এটি একটি ভিন্নধর্মী অংক । আসলে ৯ দিয়ে অনেক মজা করা যায় । চলো দেখে নিই ৯ এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য । কিছু সংখ্যাকে ৯ দ্বারা গুণ করলে অদ্ভুত ও রহস্যময় সংখ্যা পাওয়া যায় । নিচে লক্ষ্য করে দেখ প্রতিটা গুনফলের প্রথম ও শেষ অংকের যোগফল ৯ । আবার গুনফলের প্রথম কলামে রয়েছে ০-৯ পর্যন্ত ক্রম ও শেষ কলামে ৯-১ পর্যন্ত ক্রম ।

৯৮৭৬৫৪৩২১ × ৯ × ১ =	০	৮৮৮৮৮৮৮৮৮	৯
৯৮৭৬৫৪৩২১ × ৯ × ২ =	১	৭৭৭৭৭৭৭৭৭	৮
৯৮৭৬৫৪৩২১ × ৯ × ৩ =	২	৬৬৬৬৬৬৬৬৬	৭
৯৮৭৬৫৪৩২১ × ৯ × ৪ =	৩	৫৫৫৫৫৫৫৫৫	৬
৯৮৭৬৫৪৩২১ × ৯ × ৫ =	৪	৪৪৪৪৪৪৪৪৪	৫
৯৮৭৬৫৪৩২১ × ৯ × ৬ =	৫	৩৩৩৩৩৩৩৩৩	৪
৯৮৭৬৫৪৩২১ × ৯ × ৭ =	৬	২২২২২২২২২	৩
৯৮৭৬৫৪৩২১ × ৯ × ৮ =	৭	১১১১১১১১১	২
৯৮৭৬৫৪৩২১ × ৯ × ৯ =	৮	০০০০০০০০০	১

আবারো ৯ এর গুনে মজার সংখ্যা

এই টপিকেও পুর্বের ন্যায় মজার গুনফল দেখানো হয়েছে। পার্থক্য শুধু শেষ দুই অংকে। এখানে শেষ দুই অংক যথাক্রমে ০১, ০২, ০৩, ০৪... আকারে রয়েছে। এটিও ৯ এর একটি বিশেষ ধরনের গুন।

১২৩ ৪৫৬ ৭৮৯ × ৯ × ১ = ১১১ ১১১১ ১০১
১২৩ ৪৫৬ ৭৮৯ × ৯ × ২ = ২২২ ২২২২ ২০২
১২৩ ৪৫৬ ৭৮৯ × ৯ × ৩ = ৩৩৩ ৩৩৩৩ ৩০৩
১২৩ ৪৫৬ ৭৮৯ × ৯ × ৪ = ৪৪৪ ৪৪৪৪ ৪০৪
১২৩ ৪৫৬ ৭৮৯ × ৯ × ৫ = ৫৫৫ ৫৫৫৫ ৫০৫
১২৩ ৪৫৬ ৭৮৯ × ৯ × ৬ = ৬৬৬ ৬৬৬৬ ৬০৬
১২৩ ৪৫৬ ৭৮৯ × ৯ × ৭ = ৭৭৭ ৭৭৭৭ ৭০৭
১২৩ ৪৫৬ ৭৮৯ × ৯ × ৮ = ৮৮৮ ৮৮৮৮ ৮০৮
১২৩ ৪৫৬ ৭৮৯ × ৯ × ৯ = ৯৯৯ ৯৯৯৯ ৯০৯

৯ এর ভাগে লবের সংখ্যা

আমরা জানি গনিতে ১০ টি অংক আছে । কিন্তু মজার ব্যাপার হলো ১-৮ কে ৯ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হিসেবে দশমিকের পর ঐ সংখ্যা কে ইনফিনিটি পর্যন্ত পাওয়া যায় । আগেই বলেছি ৯ একটি ভিন্নধর্মী অংক ।

১ ÷ ৯ = ০.১১১১১১১১১১...
২ ÷ ৯ = ০.২২২২২২২২২...
৩ ÷ ৯ = ০.৩৩৩৩৩৩৩৩৩...
৪ ÷ ৯ = ০.৪৪৪৪৪৪৪৪৪...
৫ ÷ ৯ = ০.৫৫৫৫৫৫৫৫৫...
৬ ÷ ৯ = ০.৬৬৬৬৬৬৬৬৬...
৭ ÷ ৯ = ০.৭৭৭৭৭৭৭৭৭...
৮ ÷ ৯ = ০.৮৮৮৮৮৮৮৮৮...

π এর অজানা তথ্য

পাই (প্রতীক π, প্রাচীন গ্রিক ভাষায় পি) অথবা π একটি গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক ধ্রুবক, মোটামুটিভাবে এর মান ৩.১৪১৫৯ । ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে যেকোনও বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতকে এই ধ্রুবক দ্বারা প্রকাশ করা হয় । তবে একইভাবে এটি বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সঙ্গে এর ব্যাসার্ধের বর্গের অনুপাতের সমান।

গণিত, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিদ্যার অনেক সূত্রে পাইয়ের দেখা পাওয়া যায়। পাই একটি অমূলদ সংখ্যা, অর্থাৎ এটিকে দুইটি পূর্ণসংখ্যার ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় না । অন্যভাবে বলা যায় এটিকে দশমিক আকারে সম্পূর্ণ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তার মানে আবার এও নয় যে, এটিতে কিছু অঙ্ক পর্যাবৃত্ত বা পৌনঃপুনিক আকারে আসে । বরং দশমিকের পরের অঙ্কগুলো দৈবভাবেই পাওয়া যায় । পাই যে কেবল অমূলদ তা নয়, এটি একই সঙ্গে একটি তুরীয় সংখ্যা, অর্থাৎ এটিকে কোনও বহুপদী সমীকরণের মূল হিসাবেও গণনা করা যায় না ।

গণিতের ইতিহাস জুড়ে, নির্ভুলভাবে পাইয়ের মান নির্ণয়ের ব্যাপক চেষ্টা করা হয়েছে। এমনকি, এই ধরণের প্রচেষ্টা কখনও কখনও সংস্কৃতির অংশও হয়েছে। গ্রিক বর্ণ পাই, গ্রিক পরিধি থেকে এসেছে। সম্ভবত ১৭০৬ সালে উইলিয়াম জোনস প্রথম এটি ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে লিওনার্দ অয়েলার এটিকে জনপ্রিয় করেন। পাইকে গণিতে ব্যবহারের সময় ইংরেজি পাই (pi e) হিসেবে উচ্চারণ করা হয় যদিও এর গ্রিক উচ্চারণ পি। এটিকে কোনো কোনো সময় বৃত্তীয় ধ্রুবক, আর্কিমিডিসের ধ্রুবক অথবা রুডলফের সংখ্যাও (জার্মান গণিতবিদের নাম হতে এসেছে, যার পাইয়ের মান নিয়ে কাজ পৃথিবীখ্যাত) বলা হয়।

দশমিকের পর ৩৫০+ ঘর পর্যন্ত পাই-এর মান নিচে দেওয়া হল।

π = 3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971
6939937510 5820974944 5923078164 0628620899
8628034825 3421170679 8214808651 3282306647
0938446095 5058223172 5359408128 4811174502
8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165
2712019091 4564856692 3460348610 4543266482
1339360726 0249141273 7245870066 0631558817
4881520920 9628292540 9171536436 7892590360

দশমিকের পর ট্রিলিয়নের (১ এর পর ১২টি শূন্য, 10^{12}) বেশি ঘর পর্যন্ত পাই-এর মান বের করা হলেও সাধারণ কাজে দশমিকের পর ১২ ঘরের বেশি মান তেমন একটা প্রয়োজন হয় না । সারা দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় বৃত্তের পরিধি গণনার জন্য ৩৯ ঘরের মান ব্যবহার করলে তার সূক্ষতা হবে হাইড্রোজেন পরমাণুর সমান । π নিজেই একটি অসীম দশমিক বর্ধন কারণ π একটি অমূলদ সংখ্যা, এর দশমিক বর্ধন কখনো শেষ হয় না বা পুনরাবৃত্তি করে না। এই অসীম ধারাটি গণিতজ্ঞ ও সাধরণ মানুষকে যুগে যুগে চমৎকৃত করেছে। তাই সবাই চেষ্টা করেছে এর সঠিক মান বের করার জন্য। কেবল যে বিশ্লেষণী কাজ হয়েছ তা নয়, এই কাজে এমনকী সুপার কম্পিউটারও ব্যবহার করা হয়েছে। সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করে দশমিকের পর লক্ষ কোটি ঘর পর্যন্ত হিসাব করে কোন পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায় নি।

১৪ই মার্চ বিশ্ব পাই দিবস। সাধারণত পাই এর মান ৩.১৪ ধরা হয় বলে প্রতি বছর তৃতীয় মাসের (মার্চ মাসের) ১৪ই তারিখে পাই দিবস পালন করা হয়। কখনও কখনও পাই'র মান ৩.১৪১৫৯২৬ অনুসারে ১৪ই মার্চের দুপুর ১টা ৫৯ মিনিটে পাই দিবস পালন করা হয় । ১৯৮৮ সালে প্রথমবারের মতো পাই দিবস পালন করা হয় । বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড'র উদ্যোগে ২০০৬ সাল থেকে বাংলাদেশে পাই দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে ।

দেখে নিন এক নজরে পাই এর ইতিহাসঃ

১. উইলিয়াম জোনস সর্বপ্রথম ১৭০৬ সালে পাই প্রতিকটি ব্যবহার করেন। পাই প্রতিকটি জনপ্রিয় করেন গণিতবিদ লিওনার্দো ইউলার ।

২. পাই-এর রাজপুত্র খ্যাত পদার্থবিদ ল্যারি শ’ ১৯৮৮ সালে পাই দিবসের ধারণা প্রদান করেন ।

৩. ২০০৯ সালের ১২ মার্চ যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৪ ই মার্চকে জাতীয় পাই দিবস পালনের অনুমোদন দেন ।

৪. বর্তমানে কম্পিউটারে পাই (**π**) - এর মান এক ট্রিলিয়ন বা এক লক্ষ কোটি ঘর পর্যন্ত বের করা সম্ভব ।

৫. পাই একটি অমূলদ সংখ্যা অর্থাৎ একে দুইটি পূর্ণসংখ্যার অনুপাতে প্রকাশ করা যায় না এবং পাই একটি তুরীয় সংখ্যা বলে একে বহুপদী সমীকরণের মূল হিসেবেও গণনা করা যায় না ।

৬. দশমিকের পরে পাই-এর মান কখনো শেষ হয় না এবং এটি পুনারবৃত্তি করে না ।

৭. পাই-এর মান ৩.১৪১৫৯২৬ অনুসারে দুপুর ১টা ৫৯ মিনিট ২৬ সেকেন্ডকে পাই সেকেন্ড বলা হয় ।

৮. পাই গ্রিক বর্ণমালার ষোলোতম বর্ণ। গ্রিক শব্দ ‘περιφέρεια’ (যার অর্থ periphery) এবং ‘περίμετρος’(যার অর্থ perimeter) - এর প্রথম বর্ণ হচ্ছে **π** । ধরা হয়ে থাকে পরিধি বা perimeter শব্দটি থেকেই **π** - এর ব্যবহার হয়ে আসছে ।

৯. ইউক্লিডিয় সমতলীয় জ্যামিতিতে বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতকে পাই হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

১০. পাই-কে কোন কোন সময় বৃত্তীয় ধ্রুবক, আর্কিমিডিসের ধ্রুবক এবং রুডলফের সংখ্যাও বলা হয়।

১১. ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বা এমআইটি অনেক সময় তাদের নতুন শিক্ষার্থীদের গ্রহণপত্র পাই দিবসে ডাক দিয়ে থাকে।

১২. ২০০৬ সালে আকিরা হারাগুচি নামক এক জাপানি প্রকৌশলী পাই-এর মান ১,০০,০০০ ঘর পর্যন্ত মুখস্ত করেন

১৩. গিনেসের স্বীকৃত পাই-এর মান বলার রেকর্ড হলো ৬৭,৮৯০ ঘর, যার অধিকারী চীনের ২৪ বছর বয়স্ক স্নাতক ছাত্র লু চাও । তিনি ২৪ ঘণ্টা ৪ মিনিট সময় নিয়ে দশমিকের পর ৬৭,৮৯০ ঘর পর্যন্ত পাই-এর মান শুদ্ধভাবে বলতে সক্ষম হন ।

১৪. পাই-এর মান মনে রাখার বেশ কিছু কৌশল আছে, এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল "পাই কবিতা" । এই কবিতাগুলি এমন যে, এর প্রত্যেকটি শব্দের দৈর্ঘ্য (বর্ণ) পাইয়ের একেকটি অঙ্ক প্রকাশ করে ।

সংখ্যার রাজা ১

আমরা এক (১) কে খুব সাধারণ ভাবি তাইনা । কিন্তু আমরা একে যতটা সাধারণ ভাবি এই এক (১) কিন্তু ততটাই অসাধারণ । এটি গনিতের সবচেয়ে অলস, অসভ্য সংখ্যা । অবাক হচ্ছেন ? হওয়ার ই কথা। কারণ প্রশ্ন জাগতেই পারে অংক আবার কি করে অলস হয় ? একে অলস বললাম কারন এ খুব সহজে অন্যদের মত পরিবর্তন হয়না । যেমন ধরুন আপনি যদি ২ কে বর্গ করেন তবে ৪ পাবেন । ঘন করলে ৮ পাবেন। আবার রুট করলে ১.৪১... একটা মান পাবেন । কিন্তু ১ এতটাই অলস যে এর ওপর যতই পাওয়ার দিন না কেন এ ১ ই থাকবে । বর্গ করলেও ১ পাবেন, ঘন করলেও এক পাবেন । ৪,৫,৬,৭... যতই পাওয়ার দিন এ ১ ই থাকবে। আচ্ছা তাহলে একবার ভাবুন তো যদি ১ এর পাওয়ার ইনফিনিটি (∞) দেয়া হয় তাহলে কি হবে ? হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন । ঐ যে বললাম, আপনি যতই পাওয়ার দিন না কেন ১ ই থাকবে সারাজীবন। আবার যদি প্রশ্ন করেন যে ১ এর বর্গ মূল কত ? আমি তাও বলব সে ১ ই থাকবে । ১ এর ঘনমূল ও ১ ই হবে । ১ এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এ যেমন নিজে পরিবর্তন হয়না তেমনি অন্যকেও পরিবর্তন হতে দেয়না (+,- ছাড়া) । আপনি যে সংখ্যাকেই ১ দ্বারা গুণ করেন না কেন আবার ঐ সংখ্যাকেই ফিরে পাবেন । বিশ্বাস না হলে করে দেখুন । আবার আপনি যে সংখ্যাকেই ১ দ্বারা ভাগ দেন না কেন , ঐ সংখ্যায় ফিরে পাবেন । আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো কোন সংখ্যার ওপর পাওয়ার হিসেবে ১ বসালে আবার ঐ সংখ্যাকেই ফিরে পাবেন। এ কেমন জালা । সেই জন্যই তো বললাম এ হচ্ছে একটা অলস সংখ্যা। নিজেও পরিবর্তন হয়না আবার অন্যকেও হতে দেয়না । তাছাড়া ১ হলো সবচেয়ে ক্ষুদ্র পজিটিভ বেজোড় সংখ্যা । তবে শূন্য আবিস্কারের পুর্বে গনিতে এটিই প্রথম অংক ছিল ।

শূন্য

শূন্যের যোগ বিয়োগঃ

শূন্যের সাথে কোন সংখ্যার যোগ বা বিয়োগ করলে ফলাফল সেই সংখ্যাই হয় । কিন্তু কেন ?

ধরি, প্রথমে আমরা ৩ এর সাথে ৫ যোগ করবো এরপর ৩ হতে ৫ বিয়োগ করবো। তাহলে, সংখ্যারেখায় ৩ চিহ্নিত করি । এর সাথে ৫ যোগ করা মানে সংখ্যারেখার ডানদিকে ৫ ঘর সামনে যাওয়া । ৫ ঘর সামনে যাওয়ার পর আমরা যেই অবস্থানে পৌঁছবো, সেই অবস্থানের মানই হবে আমাদের ৩ ও ৫ এর যোগফল । অর্থাৎ, নির্ণেয় যোগফল = ৮ । আবার, ৩ হতে ৫ বিয়োগের ক্ষেত্রে বাম দিকে ৫ ঘর যেতে হবে । ফলে, নির্ণেয় বিয়োগফল = -২

এখন, কোন সংখ্যার সাথে শূন্য (০) যোগ বা বিয়োগ করা মানে সংখ্যারেখায় সেই সংখ্যা হতে শূন্য (০) ঘর ডানে বা বামে যাওয়া । কিন্তু, ০ মানে তো কিছুই নেই! তাহলে, ডানে বা বামে যাবো কিভাবে? শূন্য মানে যেহেতু ’কিছুই নেই’, সেহেতু কোন সংখ্যার সাথে শূন্য (০) যোগ বা বিয়োগ করলে সংখ্যারেখায় সেই সংখ্যাটি আগের জায়গাতেই স্থির থাকবে। ফলে, মান হবে ঐ সংখ্যাটিই ।

অতএব, যেকোনো সংখ্যা ± 0 = ঐ সংখ্যা । একইভাবে, $0 + 0 = 0$ এবং, $0 - 0 = 0$

শূন্যের গুণঃ

যেকোনো সংখ্যার সাথে শূন্য গুণ করলে ফলাফল শূন্য (০) কিন্তু কেন ? ধরি, দুইটি সংখ্যা ৩ ও ২ । এদের গুণফল আমরা বের করবো । ৩ কে ২ দ্বারা গুণ করা মানে হচ্ছে ৩ টা ২ কে যোগ করা বা ২ টা ৩ কে যোগ করা। অর্থাৎ,

$$3 \times 2 = 2+2+2 = 3+3 = 6$$

একইভাবে, কোন সংখ্যা a কে শূন্য (০) দিয়ে গুণ করা মানে হচ্ছে a সংখ্যক শূন্য (০) কে যোগ করা। ধরি, $a = 10$

তাহলে, 10×0 মানে হচ্ছে ১০ টি ০ যোগ করা বা, ০ টি ১০ যোগ করা। একটু আগে আমরা দেখলাম যে, $0 + 0 = 0$ অর্থাৎ, ১০ টি শূন্য (০) এর যোগফলও শূন্য । আবার, ০ টি ১০ এর যোগফলও শূন্য । কেননা, ০ টি ১০ মানে, কোন ১০ নেই । অতএব, $10 \times 0 = 0$. আর, এই কারণেই যেকোনো সংখ্যা $(a) \times 0 = 0$

শূন্যের ভাগঃ

শূন্যের ভাগ তিনভাবে হতে পারে। যথাঃ

১. শূন্য (০) কে যেকোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ;

২. যেকোনো সংখ্যাকে শূন্য (০) দিয়ে ভাগ;

৩. শূন্য (০) কে শূন্য (০) দিয়ে ভাগ।

প্রথমত,

শূন্য কে যেকোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ

শূন্য (০) কে যেকোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ফলাফল শূন্য। কিন্তু কেন?

দুইটি সংখ্যা a ও b. এখন, a কে b দ্বারা ভাগ করা করে যদি ফলাফল z পাওয়া যায়, তবে b ও z গুণ করলে a পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, $a \div b = z$ হলে, $b \times z = a$ হবে ।

উদাহরণ দিয়ে বোঝা যাক । দুইটি সংখ্যা ২০ ও ৫. এখন, ২০ কে ৫ দ্বারা ভাগ করলে ফলাফল হবে ৪. কেননা, ৪ ও ৫ গুণ করলে পুনরায় ২০ পাওয়া যায়। তাই, ২০ ÷ ৫ = ৪.

এখন, দুইটি সংখ্যা ০ ও ২০. ফলে, ০ কে ২০ দ্বারা ভাগ করা মানে ভাগফলকে এমন হতে হবে, যাতে ভাগফলের সাথে ২০ গুণ করলে গুণফল শূন্য (০) হয় । আমরা একটু আগে "শূন্যের গুণ" আলোচনা থেকে জানলাম যে, "কোন সংখ্যার সাথে ০ গুণ করলে ফলাফল ০ হয় ।". অতএব, ০ কে ২০ দ্বারা ভাগ করলে যেই ভাগফল পবো, সেই ভাগফল যদি শূন্য (০) ব্যাতিত অন্য কোন সংখ্যা হয়,

তাহলে আমরা কখনোই আমাদের 'ভাগফল ও ২০' এর গুণফল শূন্য (০) পাবো না। তাই, ভাগফল হবে শূন্য (০) অতএব, $0 \div 20 = 0$
এই কারণেই, শূন্য (0) ÷ যেকোনো সংখ্যা = শূন্য (0)

দ্বিতীয়ত,
যেকোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ
যেকোনো একটি সংখ্যা a হলে আসলে তা শুধুমাত্র a হিসেবে থাকে না । a এর নিচে সর্বদা 1 থাকে ভাগ হিসেবে । কেন ?

'a এর নিচে সর্বদা 1 থাকে' এর মানে হচ্ছে একমাত্র 1 এর সাথেই a কে গুণ করলে পুনরায় a পাওয়া যায়। অন্যকোন সংখ্যা থাকলে এই ঘটনা সত্য নয়। তাই, যেকোনো সংখ্যার নিচে সর্বদা +1 থাকে ভাগ হিসেবে। ফলে, $a \div 1 = a$
কিন্তু, 1 এর বদলে শূন্য দ্বারা ভাগ করলে কি হত? এটাই এবার দেখা যাক!
ধরি, যেকোনো সংখ্যা = a, শূন্য দ্বারা ভাগ করার পর ভাগফল = y তাহলে,
$a \div 0 = y$
এর অর্থ হচ্ছে, "y এর মান এমন হবে যাতে y এর সাথে 0 গুণ করলে পুনরায় a পাওয়া যায়।"
এবার a এর যেকোনো মান হিসেবে আমরা ১৫ নিলাম। তাহলে, $15 \div 0 = y$. মানে, y এর মান এমন হতে হবে যাতে এর সাথে শূন্য (০) গুণ করলে পুনরায় ১৫ পাওয়া যায়। কিন্তু, আসলেই কি y এর সুনির্দিষ্ট কোন মান কখনো পাওয়া সম্ভব? না, কখনোই না! কারণ, শূন্যের (০) সাথে আমরা যা-ই গুণ করি না কেন, ফলাফল সর্বদা শূন্যই আসবে। তাই, এক্ষেত্রে y এর কোন মান পাওয়া যাবে না। ফলে, $15 \div 0$ বা $a \div 0$ কথাটি অসংজ্ঞায়িত।
কিন্তু, আমরা তো অংক করার সময় "যেকোনো সংখ্যা (a)÷0=অসীম (∞)" লিখি। কেন? তা এবার একটু লক্ষ করা যাক।
আমরা যেকোনো সংখ্যা a = 10 নিলাম। এখন, এই 10 কে আমরা যথাক্রমে 1, 0.1, 0.001, 0.0001, 0.00001, 0.000001, 0.0000001, ... এইভাবে ভাগ করতে করতে শূন্যের দিকে এগুবো। প্রথমে ভাগফলগুলো নিচে লিখে ফেলা যাক -

$10 \div 1 = 10$

$10 \div 0.1 = 100$

$10 \div 0.01 = 1000$

$10 \div 0.001 = 10000$

$10 \div 0.0001 = 100000$

$10 \div 0.00001 = 1000000$

....

$10 \div 0 = ?$

এবার একটু লক্ষ্য করা যাক । ১০ কে আমরা যত ছোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করছি, ভাগফল ততই বড় সংখ্যা আসছে । এভাবে ছোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে করতে আমরা যখন শূন্যে পৌঁছাবো, তখন ভাগফলের মান অবশ্যই সবচেয়ে বড় হবে । কেননা, শূন্যের বাম দিকে গেলে তখন আবার আগের মানগুলোর ঋণাত্মক মানগুলো পুনরাবৃত্তি হবে। তাই, শূন্য (০) হচ্ছে সেই অবস্থান যা দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হবে সব চেয়ে বড় ! কিন্তু তা কত বড় ? - সেটাই এখন দেখার বিষয় !

১০ কে (1, 0.1, 0.001, 0.0001, 0.00001, 0.000001, 0.0000001, ….) এই ধারা অনুযায়ী ভাগ করতে করতে আমরা ভাগফলের ধারা পেলাম এইরকমঃ (10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000, 100000000, ...)

এখন,

0.1, 0.001, 0.0001, 0.00001, 0.000001, 0.0000001, ...

এই ধারার সর্বশেষ পদটি অবশ্যই শূন্য(০) হবে। কেননা, শূন্য অতিক্রম করলে ঋণাত্মক মান আসা শুরু করবে। তাই, ধারাটি এইভাবে লেখা যায়ঃ

0.1, 0.001, 0.0001, 0.00001, 0.000001, 0.0000001, ... , 0

আবার, ভাগফলের ধারা বা

10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000, 100000000, ... এই ধারার শেষে কি আছে ? ইহা অসীম পদবিশিষ্ট একটি ধারা । এর কোন শেষ নেই । অতএব এই ধারাটি অসীম পদ পর্যন্ত বিস্তৃত । তাই, ধারাটি

10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000, 100000000, ... , + ∞ এইভাবে লিখা যায় । যেহেতু, ধারাটি ধনাত্মক দিকে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত, তাই এর শেষ পদ হবে ধনাত্মক অসীম বা Positive Infinity বা
+ ∞

সুতরাং, ১০ কে শূন্য (০) দ্বারা ভাগ করলে এর ফলাফল হবেঃ + ∞
আবার, ঋণাত্মক ১০ বা -10 কে শূন্য (০) দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হবেঃ -∞
একইভাবে, যেকোনো ধনাত্মক সংখ্যাকে শূন্য (০) দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় +∞ এবং যেকোনো ঋণাত্মক সংখ্যাকে শূন্য (০) দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় -∞

"গুগল ক্যালকুলেটরে -10÷0 এর মান ঋণাত্মক অসীম (-∞) দেখা যায়" এবং "গুগল ক্যালকুলেটরে 10÷0 এর মান ধনাত্মক অসীম(+∞) দেখা যায়"

আমাদের একটা কথা মনে রাখা দরকার, অসীম কিন্তু কোন সংখ্যা নয় । ইহা কেবল একটি ধারণা মাত্র । অসীম বলতে কোন কিছুর আসলে অস্তিত্ব নেই। তাই, হিসাবের ক্ষেত্রে যেই জিনিসগুলার মান অসীম (∞), তারা সবাই আসলে অসংজ্ঞায়িত।

তৃতীয়ত,

শূন্য কে শূন্য দিয়ে ভাগ

এতক্ষণ তো আমরা শূন্য কে শূন্য ব্যতীত অন্য সকল সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা দেখলাম। যার ভাগফল হচ্ছে অসীম (∞)

তাহলে কি আমরা "০ ÷ ০ = আসীম (∞)" লিখতে পারি না ? হ্যাঁ ! অবশ্যই পারি! কেন পারবো না ? কিন্তু, কাজটা তো এখানেই শেষ নয় !

ধরি, $0 \div 0 = i$

তাহলে, i এর মান এমন হবে যাতে i এর সাথে শূন্য (০) গুণ করলে পুনরায় শূন্য পাওয়া যায়। আমরা জানি যে, শূন্য কে যেই সংখ্যা দ্বারাই গুণ করি না কেন, ফলাফল সর্বদা শূন্যই হবে । তাই, i এর মান যেকোনো কিছুই হতে পারে !

কেননা,

$i = 0$ হলে, $0 \times 0 = 0$
$i = 1$ হলে, $1 \times 0 = 0$
$i = -1$ হলে, $-1 \times 0 = 0$
$i = 2$ হলে, $2 \times 0 = 0$
$i = -2$ হলে, $-2 \times 0 = 0$
$i = 3$ হলে, $3 \times 0 = 0$
$i = -3$ হলে, $-3 \times 0 = 0 \ldots$
এভাবে আজীবন চলতে থাকবে।

অতএব, $i = (-\infty, \ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots + \infty)$

দেখা যাচ্ছে, i এর অসীম সংখ্যক মান রয়েছে! ফলে, $0 \div 0$ এর ভাগফল রয়েছে অসীম সংখ্যক! $0 \div 0$ এর ভাগফলকে নির্দিষ্ট ভাবে বলা কখনো সম্ভব না। তাই, $0 \div 0$ একইসাথে অসংজ্ঞায়িত এবং অনির্ণেয় ।
অনির্ণেয় কেন ? অনির্ণেয় মানে হচ্ছে, যার মান নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এখানে $0 \div 0$ এর অসীম সংখ্যক ফলাফল থাকায়, সুনির্দিষ্টভাবে এর ফলাফল বলা কখনোই সম্ভব নয়। তাই, $0 \div 0$ হচ্ছে অসংজ্ঞায়িত এবং অনির্ণেয় ।

শূন্য কি ধনাত্মক নাকি ঋণাত্মক ?

শূন্য আসলে এদের কোনটিই নয় ! শূন্য হচ্ছে নিরপেক্ষ।
"শূন্য হচ্ছে নিরপেক্ষ"- কথাটি বুঝবার আগে পজিটিভ (+) এবং নেগেটিভ (-) কি জিনিস তা বুঝতে হবে। যেকোনো সংখ্যা $a = \pm 1$ হলে +১ এর মানে হচ্ছে ১ বেশি আছে এবং -১ মানে হচ্ছে ১ কম আছে। কিন্তু, শূন্য (০) মানে 'কিছুই নেই'. আর, যেইখানে কিছুই নেই সেইখানে তো কম বা বেশি হবার প্রশ্নই আসে না। এই কারণে শূন্য (০) হচ্ছে চিহ্ন নিরপেক্ষ। অর্থাৎ, $+0 = -0$
একই কারণে, $0 + 0 = 0$ এবং $0 - 0 = 0$

শূন্য কি জোড় নাকি বিজোড় ?

কোন একটি সংখ্যা জোড় কখন হয় আর বিজোড় কখন হয় তা জানা থাকলেই এই প্রশ্নের জবাব দেয়া সম্ভব। শুরুতে কয়েকটা জিনিস লক্ষ্য করা যাকঃ-

১. বিজোড় এবং জোড় কে যোগ করলে সর্বদা বিজোড় সংখ্যা পাওয়া যায় ।
২. জোড় সংখ্যাকে 2n এবং বিজোড় সংখ্যাকে 2n+1 দ্বারা প্রকাশ করা যায় ।
৩. দুটি বিজোড় সংখ্যার মাঝে একটি জোড় সংখ্যা অবস্থান করে এবং দুটি জোড় সংখ্যার মাঝে একটি বিজোড় সংখ্যা অবস্থান করে ।

১.
বিজোড় এবং জোড় কে যোগ করলে সর্বদা বিজোড় সংখ্যা পাওয়া যায়
যেকোনো বিজোড় সংখ্যা $k = 3$ নিলাম । তাহলে,
৩ + ০ = ৩ = বিজোড় সংখ্যা ।
একইভাবে,
৫ + ০ = ৫; ৭ + ০ = ৭; ৯ + ০ = ৯; ১১ + ০ = ১১ ......ইত্যাদি ।
তাহলে, ১ নং অনুসারে 'শূন্য একটি জোড় সংখ্যা'।

২ .
যেকোনো পূর্ণসংখ্যা n হলে, জোড় সংখ্যাকে 2n এবং বিজোড় সংখ্যাকে 2n+1 দ্বারা প্রকাশ করা যায়। ফলে, বিজোড় সংখ্যার ক্ষেত্রে সর্বদা 1 অবশিষ্ট থাকে। যেমনঃ

$$1 = 1\times0 + 1 = 0+1$$
$$3 = 2\times1 + 1 = 2+1$$
$$5 = 2\times2 + 1 = 4+1$$
$$7 = 3\times2 + 1 = 6+1$$
$$9 = 4\times2 + 1 = 8+1$$

এভাবে চলতে থাকবে।

দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিটি বিজোড় সংখ্যা একটি জোড় সংখ্যা এবং ১ এর সমষ্টি। প্রত্যেকটি বিজোড় সংখ্যার শেষে ১ অবশেষ থাকে।

জোড় সংখ্যার ক্ষেত্রেঃ

$$2 = 1\times2 = 2$$
$$4 = 2\times2 = 4$$
$$6 = 3\times2 = 6$$
$$8 = 4\times2 = 8$$
$$10 = 5\times2 = 10$$

এভাবে চলতে থাকবে ।

জোড় সংখ্যার ক্ষেত্রের বিজোড়ের মত কোন ১ অবশিষ্ট থাকে না ।

এবার শূন্যের ক্ষেত্রেঃ

$$0 = 0\times0 = 0\times1 = 0\times2 = 0\times3 = 0\times4 = 0\times5 = \ldots = 0$$

অতএব, শূন্যের ক্ষেত্রেও কোন অবশেষ থাকছে না। তাই, ২ অনুসারে "শূন্য একটি জোড় সংখ্যা।"

৩ অনুসারে, পূর্ণসংখ্যার সিরিজ- ..., -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ...

এখানে ৩ বিজোড় সংখ্যা। কেননা, ৩ এর দুই পাশে দুটি জোড় সংখ্যা ২ ও ৪ আছে। আবার, ২ জোড় সংখ্যা। কারণ, এর দুইপাশে দুটি বিজোড় সংখ্যা ১ ও ৩ আছে ।
এখন, ১ বিজোড় সংখ্যা । এর দুই পাশে ০ ও ২ আছে। ২ জোড় সংখ্যা। ১ কে বিজোড় হতে হলে ০ কে অবশ্যই জোড় হতে হবে। তাই, শূন্য হচ্ছে জোড় সংখ্যা ।
আবার, শূন্যের (০) দুই পাশে -১ ও +১ আছে। যারা উভয়েই বিজোড় সংখ্যা। তাই, এদের মাঝখানে অবস্থিত শূন্য (০) কে অবশ্যই জোড় সংখ্যা হবে।
অতএব, শূন্য একটি জোড় সংখ্যা ।

শূন্যের পাওয়ার বা ঘাত শূন্য হলে কি হয় ?

এই বিষয়টি বুঝার আগে গণিতে "পাওয়ার বা ঘাত" এর কাজ সম্বন্ধে ভালো ধারণা থাকা প্রয়োজন। পাওয়ার বা ঘাতের কাজ কি ?
ধরি, a একটি সংখ্যা। এর পাওয়ার বা ঘাত 2 দেয়া মানে দুইটা a গুণ আকারে আছে। একইভাবে তিন দেয়া মানে তিনটা a গুণ আকারে আছে। অর্থাৎ,

$$a^2 = a \times a$$
$$a^3 = a \times a \times a$$

a এর পাওয়ার 1 থাকা মানে ১ টা a গুণ আকারে আছে। কিন্তু, এই ১ টা a কিসের সাথে গুণ আকারে ? এটি আসলে 1 এর সাথে গুণ আকারে আছে। আমরা যখন কোন সংখ্যা কে অন্য কোন সংখ্যা দ্বারা গুণ করি, সেখানে আসলে আগে থাকতেই 1 গুণ আকারে থাকে। কারণ, 1 ব্যতীত অন্য কোন সংখ্যা গুণ করলে গুণফল পরিবর্তন হয়ে যাবে। তাই, সকল গুণের আগে আমরা 1 কে গুণ আকারে লিখতে পারি। 1 কে গুণ আকারে লিখা, না লিখে একই কথা হওয়ার আমরা একে সচারচর লিখি না। যদি লিখতাম, তাহলের উপরের লাইন দুটি এমন হতঃ

$$a^2 = 1 \times a \times a$$
$$a^3 = 1 \times a \times a \times a$$

অর্থাৎ, প্রত্যেক গুণের শুরুতেই 1 গুণ আকারে থাকে। সেই হিসেবে, a এর পাওয়ার 1 থাকা মানে, 1 এর সাথে ১ টি a গুণ আকারে আছে।

$$a^1 = 1 \times a = a$$

"গুগল ক্যালকুলেটরে 00 এর মান 1 দেখাচ্ছে"
এখন যদি a এর পাওয়ার শূন্য (০) হয়, তাহলে কি হবে?
'a এর পাওয়ার বা ঘাত শূন্য (০)'- এই কথাটির মানে হচ্ছে, "1 এর সাথে ০ টি a গুণ আকারে আছে। বা, 1 এর সাথে কোন a গুণ আকারে নেই।"
ফলে, 1 একাই থাকে। এর সাথে কারো গুণ হয় নি। তাই a এর পাওয়ার শূন্য হলে এর মান 1

$$a^0 = 1$$

একইভাবে, 00এর মানে হচ্ছে 0 টি 0 গুণ আকারে আছে। মানে, আগে থেকেই যে 1 আছে তার সাথে কোন শূন্য(০) গুণ আকারে নেই। অর্থাৎ, এক্ষেত্রেও উত্তর হবে 1.

সুতরাং, $0^0=1$

অতএব, শূন্যের পাওয়ার বা ঘাত শূন্য হলে তার মান এক (১) হয়।

আবার, শূন্যের পাওয়ার বা ঘাত যদি শূন্য ব্যতীত অন্য কোন সংখ্যা হয়, তাহলে কিন্তু তার মান হয় শূন্য। যেমন, শূন্যের পাওয়ার ৫ হওয়া মানে "1 এর সাথে ৫ টা শূন্য (০) গুণ আকারে আছে". অর্থাৎ,

$$05 = 1 \times 0 \times 0 \times 0 \times 0 \times 0 = 0$$

তাই, শূন্যের পাওয়ার বা ঘাত শূন্য হলে তার মান এক (১) হয়। আর, শূন্যের পাওয়ার বা ঘাত যদি শূন্য ব্যতীত অন্য কোন সংখ্যা হয়, তাহলে কিন্তু তার মান হয় শূন্য ।

আধ্যাত্মিক সংখ্যা ৮

অক্টোপাসের শুড়ের সংখ্যা ৮টি, মাকড়সার পায়ের সংখ্যা ৮ টি, এছাড়া বিছা (Scorpion) এর পায়ের সংখ্যাও ৮ টি ।সাধারণত একটি ছাতার আট টি পাজর থাকে। দাবা খেলায়, প্রত্যেকটি খেলয়াড়ের আট টি সিপাহি থাকে। দাবা বোর্ড ৮ বাই ৮। একটি ঘনকের ৮ টি কোণা বা শীর্ষবিন্দু থাকে ।

একটি অষ্টভুজ এর ৮ টি বাহু থাকে এবং একটি Octahedron (আটটি সমান বাহু বিশিষ্ট ঘনক্ষেত্র) এর থাকে ৮ টি ত্রিভুজাকৃতির তল। আমাদের শরীরে ২টি করে হাত,পা,কান,চোখ আছে = মোট ৮ টি । যে কোন তারিখ প্রকাশ করতে গেলে আপাতত ৮ টি ডিজিটের দরকার পড়ে। যেমন: ২৬-০৮-২০১৮ ।

কোন মানুষকে ধ্বংস করার ৮ টি পর্যায় আছে, ৮ টি ধাপ। একে অষ্টিধিক বন্ধোনম বলা হয় । কীর্তি, বুদ্ধি, ক্ষমতা, আবেগ, সাহস, পয়সা, নৈতিকতা । আর যে এই ৭ ভাবে ধ্বংস হবে তার বেচে থাকা আর মরে যাওয়া একই কথা।মৃত্যু তো উপরাল্লাহর হাতে। কিন্তু এই ৭ টা মানুষের দ্বারা ধ্বংস সম্ভব ।

সাধারণভাবে, “আট” বৌদ্ধদের জন্য একটি শুভ সংখ্যা বলে মনে করা হয়, যেমন, “আটটি পবিত্র প্রতীক” (গহনা-সংকীর্ণ প্যারাসোল; সোনারফিশ (সর্বদা একটি জোড়া হিসাবে দেখানো হয়, যেমন, মিনারের গ্লিফ); স্ব- অ্যামফোরা পুনঃনির্মাণ করা, সাদা কামাল কমল-ফুল, সাদা শঙ্কু; শাশ্বত (সেল্টিক-শৈলী, অসীম লুপিং) গিঁট; সাম্রাজ্য বিজয়ের ব্যানার; আটটি স্পোকড চাকা যা রাষ্ট্রের জাহাজকে নির্দেশ করে বা বুদ্ধের শিক্ষাকে প্রতীক করে। একইভাবে, বুদ্ধের জন্মদিন চীনা ক্যালেন্ডারের চতুর্থ মাসের ৮ তারিখে পড়ে ।

ইসলাম ধর্মে বলা হয় আল্লাহ-র সিংহাসন বহনকারী ফেরেশতাগণের সংখ্যা আট, যা একইসাথে স্বর্গের দরজার সংখ্যা ।

এবার সাংখ্যিক জগতে দেখি কি অবস্থা

সংখ্যা ৮ সর্বনিম্ন অ-আবেলি গ্রুপের ক্রম। ৮ একমাত্র কিউব সংখ্যা যার সাথে ১ যোগ করলে একটা বর্গ সংখ্যা পাওয়া যায়।

$$2^3 = 8 \text{ (Eight) এবং } 2^3 + 1 = 8 + 1 = 9$$

যিশুখ্রিস্টের জন্মের আগে গ্রীক এবং রোমদের সপ্তাহ হিসাব করা হত ৮ দিনে।

অকটাল সংখ্যা একটি সিস্টেমের বেস, যা বেশিরভাগ কম্পিউটারের সাথে ব্যবহার করা হয়। অক্টালের মধ্যে এক অঙ্ক তিন বিট প্রতিনিধিত্ব করে। আধুনিক কম্পিউটারে, একটি বাইট আটটি বিটে একটি গোষ্ঠী হয়, একে অক্টেট বলা হয়।

৮ একটি সংখ্যা যা দুইটি মৌলিক সংখ্যা ৩ ও ৫ এর যোগফল। সপ্তসুর এর নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই । সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি । এই ৭ টি কে বলা হয় সপ্তসুর । কিন্তু, কোথাও একটা কি যেন বাদ পড়ে গেল। এই সপ্তসুরের শেষে একটা “সা” হবে । আপনি যদি শুধু এই সপ্তসুর পর্যন্ত গেয়ে শেষ করেন তাহলে কিন্তু সুরটা অসম্পুর্ন থেকে যাবে। শেষে “সা” বললে বিপদটা থেকে উদ্ধার পাবেন । তাই, একে সপ্তসুর না বলে অষ্টসুর বলা হয় । অষ্টসুরের দুই ধরণের স্কেল থেকে । একটি নিম্ন (সা..রে..গা..মা) অপরটি উচ্চ (পা..ধা..নি..সা) এবং মাঝখানে রয়েছে কিছুটা বিরতি।

মজার সংখ্যা ১৩২

১৩২ এর একটি মজার রহস্য হলো এটি যে তিনটি অংক নিয়ে তৈরি সেই অংক গুলো দিয়ে দুই অংকের যতগুলো সংখ্যা তৈরি করা সম্ভব সেগুলো পরষ্পর যোগ করলে ১৩২ পাওয়া যায়। এভাবে পাওয়া সংখ্যা গুলোর মাঝে এটিই সবচেয়ে ক্ষুদ্র।

১৩ + ১২ + ৩১ + ৩২ + ২১ + ২৩ = ১৩২

মজার সংখ্যা ১৬৯

১৬৯ এর বেশ কয়েকটি অবিশ্বাস্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা হয়তো আপনি এর আগে কখনো ভেবে দেখেননি বা কল্পনাও করেননি।

১৬৯ = ১৩২

আবার আমরা যদি ১৬৯ কে উল্টো করে ৯৬১ লিখি ১৬৯ এর বর্গ মূল ১৩ ও উল্টে ৩১ হয়ে যাবে।

৯৬১ = ৩১২

কি বিষয়টা মজার নাহ্ ?

আবার এটা যে তিনটি অংক নিয়ে তৈরি হয়েছে তার ফ্যাক্টোরিয়াল যোগ করা হলে পাওয়া যাবে

১! + ৬! + ৯! = ৩৬৩৬০১

এবার ৩৬৩৬০১ এর অংক গুলোর ফ্যাক্টোরিয়াল যোগ করলে পাওয়া যাবে

৩! + ৬! + ৩! + ৬! + ০! +১! = ১৪৫৪

১৪৫৪ এর অংক গুলোর ফ্যাক্টোরিয়াল যোগ করলে পাওয়া যাবে

১! + ৪! + ৫! +৪! = ১৬৯

এছাড়া একে ১২২ + ৫২ = ১৩২ = ১৬৯ রুপে লিখা যায় যা পিথাগোরাস এর উপপাদ্য মেনে চলে।

৬ থেকে ৯

শুরু থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি ৯ একটা অসাধারন মজার সংখ্যা। ৯ এর সাথে এবার জুড়ে দিয়েছি ৬ কে। আমরা যেভাবে ৬ থেকে ৯ এ যেতে পারি : প্রথমে ৬ নিন। ৬ এর বর্গ করুন। দুই অংকের যে সংখ্যা পাবেন সেই অংক দুইটি যোগ করুন। পেয়ে যাবেন কাঙ্খিত ৯। বলে রাখা ভালো n সংখ্যক ৬ নিলে 2n সংখ্যক অংকের সংখ্যা পাবেন। নিচে দেয়া হলো :

৬^2 = ৩৬ = ৩+৬ = ৯

৬৬^2 = ৪৩৫৬ = ৪৩+৫৬ = ৯৯

৬৬৬^2 = ৪৪৩৫৫৬ = ৪৪৩+৫৫৬ = ৯৯৯

৬৬৬৬^2 = ৪৪৪৩৫৫৫৬ = ৪৪৪৩+৫৫৫৬ = ৯৯৯৯

৬৬৬৬৬^2 = ৪৪৪৪৩৫৫৫৫৬ = ৪৪৪৪৩+৫৫৫৫৬ = ৯৯৯৯৯

৭ এর গুনে মজার সংখ্যা

৯ দেখলাম, ৬ দেখলাম চলো এবার ৭ এর চমক দেখে আসি। আমরা জানি ৭ একটি মৌলিক সংখ্যা। আমরা পাঠ্যপুস্তকে ৭ সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতে পারিনি। তাই ৭ এর চমক নিয়ে হাজির হলাম। এছাড়া ৭ একটা ট্রানকেটেবল প্রাইম সংখ্যা। এ সম্পর্কে আমরা পরে জানবো। তার আগে দেখে নিই ৭ এর একটি মজার বৈশিষ্ট্য।

১৪৪৩০০১৪৪৩ × ৭ = ১০১০১০১০১০১

২৮৮৬০০২৮৮৬ × ৭ = ২০২০২০২০২০২

৪৩২৯০০৪৩২৯ × ৭ = ৩০৩০৩০৩০৩০৩

৫৭৭২০০৫৭৭২ × ৭ = ৪০৪০৪০৪০৪০৪

৭২১৫০০৭২১৫ × ৭ = ৫০৫০৫০৫০৫০৫

৮৬৫৮০০৮৬৫৮ × ৭ = ৬০৬০৬০৬০৬০৬

১০১০১০১০১০১ × ৭ = ৭০৭০৭০৭০৭০৭

১১৫৪৪০১১৫৪৪ × ৭ = ৮০৮০৮০৮০৮০৮

১২৯৮৭০১২৯৮৭ × ৭ = ৯০৯০৯০৯০৯০৯

৮ এর একটি অদ্ভুদ জাদু

৬,৭,৯ এর মতো ৮ এর ও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমেই জেনে এসেছি ৮ একটি আধ্যাত্মিক সংখ্যা। ৮ এর গুনে উল্টো সংখ্যা পাওয়া যায়। উল্টো সংখ্যা ৯ এর গুনেও পাওয়া যায়। এখানে দেখতে পাবেন একটি মজার ঘটনা। চলুন দেখে আসি

১ × ৮+১ = ৯

১২ × ৮+২ = ৯৮

১২৩ × ৮+৩ = ৯৮৭

১২৩৪ × ৮+৪ = ৯৮৭৬

১২৩৪৫ × ৮+৫ = ৯৮৭৬৫

১২৩৪৫৬ × ৮+৬ = ৯৮৭৬৫৪

১২৩৪৫৬৭ × ৮+৭ = ৯৮৭৬৫৪৩

১২৩৪৫৬৭৮ × ৮+৮ = ৯৮৭৬৫৪৩২

১২৩৪৫৬৭৮৯ × ৮+৯ = ৯৮৭৬৫৪৩২১

এখানে আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো

১ + ৯ = ১০

১২ + ৯৮ = ১০০

১২৩ + ৯৮৭ = ১০০০

১২৩৪ + ৯৮৭৬ = ১০০০০

১২৩৪৫ + ৯৮৭৬৫ = ১০০০০০

১২৩৪৫৬ + ৯৮৭৬৫৪ = ১০০০০০০

১২৩৪৫৬৭ + ৯৮৭৬৫৪৩ = ১০০০০০০০

১২৩৪৫৬৭৮ + ৯৮৭৬৫৪৩২ = ১০০০০০০০০

১২৩৪৫৬৭৮৯ + ৯৮৭৬৫৪৩২১ = ১০০০০০০০০০

৩ এর ম্যাজিক

৩ কে ১ ও ২ দ্বারা গঠিত প্যালিন্ড্রমিক সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে গুনফলে ৩ ও ৬ এর প্যালিন্ড্রমিক সংখ্যা পাওয়া যায়। তো প্রশ্ন জাগতে পারে প্যালিন্ড্রমিক সংখ্যা টা কি ? পরের টপিকস এ সেটা জানবো কিন্তু এখন দেখে নিই ৩ এর ম্যাজিক।

১২১ x ৩ = ৩৬৩
১২২১ x ৩ = ৩৬৬৩
১২২২১ x ৩ = ৩৬৬৬৩
১২২২২১ x ৩ = ৩৬৬৬৬৩
১২২২২২১ x ৩ = ৩৬৬৬৬৬৩
১২২২২২২১ x ৩ = ৩৬৬৬৬৬৬৩
১২২২২২২২১ x ৩ = ৩৬৬৬৬৬৬৬৩

প্যালিন্ড্রমিক সংখ্যা

প্যালিন্ড্রমীয় সংখ্যা হচ্ছে বিশেষ এক ধরনের সংখ্যা, যার অঙ্ক গুলি উল্টো করে লিখলেও সংখ্যাটি একই থাকে। 1013101 এরকম একটি সংখ্যা। প্যালিনড্রমিক শব্দটি প্যালিনড্রম থেকে এসেছে, যা সেই সমস্ত শব্দকে নির্দেশ করে, যাদেরকে উল্টো করে পড়লেও শব্দটি একই থাকে। যেমন, রমাকান্তকামার।

প্যালিনড্রমিক সংখ্যা নিয়ে মজার বিষয় হচ্ছে কোন সংখ্যার প্যালিনড্রমিক সংখ্যার সাথে উক্ত সংখ্যার বিয়োগফল শূণ্য।

কিছু প্যালিনড্রমিক এবং মৌলিক সংখ্যা নিচে দেয়া হলো
2, 3, 5, 7, 11, 101, 131, 151...... ইত্যাদি

কিছু প্যালিনড্রমিক এবং পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নিচে দেয়া হলো
0, 1, 4, 9, 121, 484, 676, 10201, 12321...... ইত্যাদি

প্যালিনড্রোম (ইংরেজি: Palindrome) হল এমন কিছু বিশেষ শব্দ আর সংখ্যা যার আরম্ভ বা শেষ দুদিক থেকেই পড়লে শব্দের উচ্চারণ আর অর্থের কোন বদল হয় না; বা সংখ্যার মান একই থাকে (সংখ্যার ক্ষেত্রে)। মূল গ্রীক শব্দ প্যালিনড্রোমাস (অর্থ: Running back again) থেকে ইংরেজি প্যালিনড্রোম শব্দটি এসেছে। καρκινικός বাংলা ভাষায় একে দ্বিমুখী শব্দ বা সংখ্যা বলা যায়। এধরণের দ্বিমুখী শব্দ বা বাক্য সাজাতে যারা দক্ষ তাঁদের ‘পেলিনড্রোমিস্ট’ বলা হয়।

প্যালিনড্রোমিক লেখা প্রাচীন ‘কিরাতার্জুনীয়’ কাব্যের বহু অনুচ্ছেদে দেখা যায়। এমনই একটি অনুচ্ছেদ হল- “সারস নয়না ঘন অঘ নারচিত রতার কলিক হর সার রসাসার রসাহর কলিকর তারত চিরনাঘ অনঘ নায়ন সরসা”, চতুর্দশ শতকে দৈবজ্ঞ সূর্য পণ্ডিতের লেখা ‘রামকৃষ্ণ বিলোম কাব্যম’ নামে ৪০টি শ্লোকের

যে বিখ্যাত কবিতা রয়েছে তার রচনাশৈলীও ভারি অদ্ভুত। প্রতিটি শ্লোকই এক-একটি প্যালিনড্রোম। আবার কবিতাটি সামনে থেকে পড়লে রাম ও রামায়ণের কাহিনি আর পেছন থেকে পড়লে কৃষ্ণ ও মহাভারতের কাহিনি। যেমন ৩ নং শ্লোকে রয়েছে

"তামসীত্যসতি সত্যসীমতা মায়য়াক্ষমসমক্ষয়ায়মা ।
মায়য়াক্ষমসমক্ষয়ায়মা তামসীত্যসতি সত্যসীমতা।।"

গণিতে প্যালিনড্রোমঃ

আশ্চর্যের বিষয় হল গণিতে প্যালিনড্রোমিক সংখ্যার অভাব নেই। সাধারণভাবে যে কেউ হাজার হাজার প্যালিনড্রোমিক সংখ্যা তৈরি করতে পারবে, যেমন ১১, ২২, ১২১, ২৩২, ২৪৪২, ১২৩২১ ইত্যাদি। তবে সহজ অ্যালগোরিদম পদ্ধতিতে (নির্দেশমত সুনির্দিষ্ট ধাপে) যে কোনও অ-প্যালিনড্রোমিক সংখ্যাকে প্যালিনড্রোমিক সংখ্যায় পরিণত করা যায়। যেমন ধরা যাক, একটি সংখ্যা হল ৫৭ (দুই, তিন, চার বা তার বেশি অঙ্কের সংখ্যা ধরা যেতে পারে)। এবার সংখ্যাটিকে উল্টে দেওয়া হল। তাহলে সংখ্যাটি হল ৭৫। এবার এই দুটি সংখ্যা যোগ করা হল। তাহলে এবার সংখ্যাটি হল (৫৭+৭৫)=১৩২। একেও উল্টে দেওয়া হল। তাহলে সংখ্যাটি হল ২৩১। আবার এই দুটো সংখ্যা যোগ করা হল। যোগফল হল (১৩২+২৩১)=৩৬৩। এটি একটি প্যালিনড্রোমিক সংখ্যা।

তিন অঙ্কের সংখ্যা নিয়ে দেখা যাক। ধরা যাক সংখ্যাটি ২৫৫। একই নিয়মে ২৫৫+৫৫২=৮০৭, ৮০৭+৭০৮=১৫১৫, ১৫১৫+৫১৫১=৬৬৬৬। তিন ধাপেই পাওয়া গেল প্যালিনড্রোমিক সংখ্যা। এভাবেই যে কোনও সংখ্যাকেই এই নিয়মে পর পর যোগ করে গেলে একসময় প্যালিনড্রোমিক সংখ্যা চলে আসবে। তবে এ যাবৎ সবচেয়ে দেরিতে যে সংখ্যাটির প্যালিনড্রোম তৈরি করা গেছে এই নিয়মে তা হল ১,১৮৬,০৬০,৩০৭,৮৯১,৯২৯,৯৯০ । ২৬১ ধাপের পর এটি প্যালিনড্রোমে পরিণত হয়। পাশাপাশি অঙ্কে প্যালিনড্রোমিক-মজার দৃষ্টান্তও প্রচুর।

যেমন- ৯ সংখ্যাটির প্যালিনড্রোম জাদু। ৯-এর সব গুণিতককে (যেমন ০,৯,১৮,২৭,.... ৯০) পর পর পাশাপাশি লিখলে তা কিন্তু লম্বা একটা প্যালিনড্রোমিক সংখ্যা হয়ে যাবে। সংখ্যাটি হল- ০৯১৮২৭৩৬৪৫৫৪৬৩৭২৮১৯০ । আবার ১ সংখ্যাটিরও আছে প্যালিনড্রোমিক ম্যাজিক। ১ দিয়ে তৈরি সমসংখ্যক অঙ্কের দুটি সংখ্যার গুণফল সবসময় প্যালিনড্রোমিক হবে। যেমন-

১১ X ১১ = ১২১
১১১ X ১১১ = ১২৩২১
১১১১ X ১১১১ = ১২৩৪৩২১
১১১১১ X ১১১১১ = ১২৩৪৫৪৩২১
১১১১১১ X ১১১১১১ = ১২৩৪৫৬৫৪৩২১
১১১১১১১ X ১১১১১১১ = ১২৩৪৫৬৭৬৫৪৩২১
১১১১১১১১ X ১১১১১১১১ = ১২৩৪৫৬৭৮৭৬৫৪৩২১
১১১১১১১১১X১১১১১১১১১ = ১২৩৪৫৬৭৮৯৮৭৬৫৪৩২১
ইত্যাদি।

আবার প্যালিনড্রোমিক গুণফলগুলোর মধ্যে একটা সামঞ্জস্যও লক্ষণীয়। দুই অঙ্কের সংখ্যার গুণফলের মাঝের সংখ্যা ২, তিন অঙ্কের সংখ্যার গুণফলের মাঝের সংখ্যা ৩, চার অঙ্কের সংখ্যার গুণফলের মাঝের সংখ্যা ৪ ইত্যাদি। প্যালিনড্রম নয় এমন একটিই সংখ্যা পাওয়া গেছে যার ঘনফল হল একটি প্যালিনড্রোমিক সংখ্যা। সংখ্যাটি হল ২২০১। অনেক সংখ্যা আছে যেগুলোর বর্গ হল প্যালিনড্রোম। যেমন- ১১-এর বর্গ ১২১, ২২-এর বর্গ ৪৮৪, ২৬-এর বর্গ ৬৭৬, ১০১-এর বর্গ ১০২০১, ১২১-এর বর্গ ১৪৬৪১ ইত্যাদি। একইভাবে ৭, ১১, ১০১ ও ১১১ সংখ্যাগুলির ঘনফল (Cube) যথাক্রমে ৩৪৩, ১৩৩১, ১০৩০৩০১ ও ১৩৬৭৬৩১ হল প্যালিনড্রোম।

চতুর্থ পাওয়ারের প্যালিনড্রোমিক সংখ্যাও আছে, যেমন ১৪৬৪১, ১০৪০৬০৪০১, ১০০৪০০৬০০৪০০১ ইত্যাদি। কিন্তু পাঁচ পাওয়ারের প্যালিনড্রোমিক সংখ্যা এখনও পাওয়া যায়নি।

বেশ কিছু মৌলিক সংখ্যা আছে যেগুলো প্যালিনড্রোম। তিন অঙ্কের সংখ্যার মধ্যে রয়েছে ১৫টি সংখ্যা, যেমন ১০১, ১৩১, ১৫১, ১৮১, ১৯১, ৩১৩, ৩৫৩, ৩৭৩, ৩৮৩, ৭২৭, ৭৫৭, ৭৮৭, ৭৯৭, ৯১৯, ৯২৯। আবার পাঁচ অঙ্কের সংখ্যার মধ্যে রয়েছে ৯৩টি মৌলিক সংখ্যা। সাত অঙ্কের সংখ্যার মধ্যে রয়েছে ৬৬৮টি। দুটি ক্রমিক সংখ্যার গুণফলের ক্ষেত্রে প্যালিনড্রোম সংখ্যা তৈরি হয় পাঁচটি ক্ষেত্রে। যেমন ১৬×১৭=২৭২, ৭৭×৭৮=৬০০৬, ৫৩৮×৫৩৯=২৮৯৯৮২, ১৬২১×১৬২২=২৬২৯২৬২, ২৪৫৭×২৪৫৮=৬০৩৯৩০৬ । তিনটি ক্রমিক সংখ্যার গুণফলের ক্ষেত্রে প্যালিনড্রোম হয় মাত্র একটি ক্ষেত্রে, ৭৭×৭৮×৭৯=৪৭৪৪৭৪ ।

আবার প্যালিনড্রোমে বিন্যস্ত দুটি সংখ্যার গুণফল হয় প্যালিনড্রোমে বিন্যস্ত অপর দুটি সংখ্যার গুণফল- এমন মজাদার সংখ্যাও নেহাত কম নেই। দু'চারটে নমুনা দেওয়া যাক- ১৪৪×৪৪১=২৫২×২৫২, ১২২৪×৪২২১=২১৪২×২৪১২, ১৩৩৪৪×৪৪৩৩১=২৩৩৫২×২৫৩৩২ ইত্যাদি।

গত শতাব্দীর একমাত্র প্যালিনড্রোমিক বছর ছিল ১৯৯১ সাল। একবিংশ শতাব্দীতে ফেলে আসা ২০০২ সালটিই হল একমাত্র প্যালিনড্রোমিক সাল। আর পরের শতাব্দীতে ২১১২ হবে প্যালিনড্রোমিক বছর।

আবার দিন, মাস ও সাল ধরে আট সংখ্যার তারিখ খুঁজে দেখলে বর্তমান শতাব্দীতে কুড়িটি প্যালিনড্রোমিক তারিখ পাওয়া যাবে, যেমন প্রথমটি ছিল ১০.০২.২০০১। তারপর চলে গেছে ২০.০২.২০০২, ১১.০২.২০১১ ও ২১.০২.২০১২। আর আসতে বাকি আছে

০২.০২.২০২০, ১২.০২.২০২১, ২২.০২.২০২২, ১৩.০২.২০৩১, ২৩.০২.২০৩২, ১৪.০২.২০৪১, ২৪.০২.২০৪২, ১৫.০২.২০৫১, ২৫.০২.২০৫২, ১৬.০২.২০৬১, ২৬.০২.২০৬২, ১৭.০২.২০৭১, ২৭.০২.২০৭২, ১৮.০২.২০৮১ , ২৮.০২.২০৮২, ১৯.০২.২০৯১ এবং ২৯.০২.২০৯২।

সুতরাং বলা যায় এই শতাব্দি হল আট সংখ্যার তারিখের ভিত্তিতে প্যালিনড্রোম সমৃদ্ধ। বিগত সহস্রাব্দে শেষ যে আট সংখ্যার তারিখটি আমরা প্যালিনড্রোম হিসেবে পেয়েছি তা দ্বাদশ শতাব্দীতে - ২৯.১১.১১৯২।

বাংলা প্যালিনড্রোমঃ

বাংলায় প্যালিনড্রোমিক শব্দ অনেক থাকলেও প্যালিনড্রোমিক বাক্য খুব বিরল। কারণ বাংলায় যুক্তবর্ণ ও যুক্তাক্ষরের ব্যবহার প্রচুর। প্যালিনড্রোমিক শব্দের মধ্যে বহুশ্রুত দুই অক্ষরের শব্দ হল- বাবা, দাদা, মামা, কাকা, চাচা, নানা, লালা, চিঁচিঁ, হিহি, জুজু ইত্যাদি।
তিন অক্ষরের প্যালিনড্রোমিক শব্দের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি, যেমন- মরম, মলম, দরদ, জলজ, যমজ, তফাত, মধ্যম, বাহবা, চামচা, সন্ন্যাস, সন্ত্রাস, সরেস, সমাস, সহিস, নতুন, নরুন, নরেন, নন্দন, নবীন, কালিকা ইত্যাদি।
একটু বড় প্যালিনড্রোমিক শব্দ হল বনমানব, নবজীবন। প্যালিনড্রোমিক নামও বাংলায় আছে বেশ কিছু – মহিম, নরেন, নটেন, কনক, কটক ইত্যাদি। তবে রমাকান্ত কামার ছাড়াও সুবললাল বসু, সদানন দাস, রায়মনি ময়রা, হারান রাহা, নিধুরাম রাধুনি, দেবী দে ইত্যাদি পদবিসহ প্যালিনড্রোমিক নাম বিরল হলেও বাস্তবে থাকা অসম্ভব নয়।

বাংলায় অর্থপূর্ণ প্যালিনড্রোমিক বাক্য গঠন করা বেশ কষ্টসাধ্য। তবুও সরল কিছু শব্দ সহযোগে ছোট ছোটো প্যালিনড্রোমিক বাক্য গঠন করা যায়। বই চাইব, তুমি কি মিতু, বিকল্প কবি, ঘুরবে রঘু, সীমার মাসী, ইভার ভাই, নাম লেখালেম না ইত্যাদি হলো প্রচলিত প্যালিনড্রোমিক ছোট্টো বাক্য।

বাংলা প্যালিনড্রোমিস্টঃ

বাংলায় উভমুখীসম শব্দ তৈরির অগ্রদূত দাদাঠাকুর খ্যাত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। তিনিই সম্ভবত প্রথম বাঙালি যিনি বাংলায় প্যালিনড্রোম নিয়ে গভীরভাবে চর্চা করেছেন। তার জন্মসাল ১৮৮১। সালটা কিন্তু একটা প্যালিনড্রোমিক বছর। আর জন্ম তারিখ বাংলায় ১৩ বৈশাখ (১২৮৮ বঙ্গাব্দ)। ১৩ বৈশাখ সংখ্যায় লিখলে

এভাবে লেখা হয় – ১৩/১। এটাও একটা প্যালিনড্রোম। আর দাদাঠাকুরের প্রয়াণ তারিখও জন্ম তারিখেই – ১৩ বৈশাখ। জীবন শুরু যে তারিখ দিয়ে, মৃত্যুও সেই তারিখে। দাদাঠাকুরের জীবৎকালও একটা প্যালিনড্রোম! তিনি নিজেও তাঁর 'বিদুষক' পত্রিকায় বহু প্যালিনড্রোম সৃষ্টি করে বাংলাভাষায় প্যালিনড্রোমকে সমৃদ্ধ করেছেন। কাক কাঁদে কাক কাঁ; চেনা সে ছেলে বলেছে সে নাচে; তাল বনে নেব লতা; মার কথা থাক রমা; রমা তো মামা তোমার; চার সের চা; বেনে তেল সলতে নেবে; ক্ষীর রস সর রক্ষী; কেবল ভুল বকে; দাস কোথা থাকো সদা? নিমাই খসে সেখ ইমানি; থাক রবি কবির কথা, বিরহে রাধা নয়ন ধারা হেরবি – ইত্যাদি হল দাদাঠাকুর সৃষ্ট অমর প্যালিনড্রোম। তাঁর সৃষ্ট 'কীর্তন মঞ্চ পরে পঞ্চম নর্তকী' বাংলাভাষায় সর্বাধিক জটিল ও সর্বাধিক শব্দ সমন্বিত প্যালিনড্রোম।

তার লেখা একটি প্যালিনড্রোম কবিতা-

রাধা নাচে অচেনা ধারা
রাজন্যগণ তরঙ্গরত, নগণ্য জরা
কীলক - সঙ্গ নয়নঙ্গ সকল কী ?
কীর্তন মঞ্চ 'পরে পঞ্চম নর্তকী

দাদাঠাকুরের লেখা এই কবিতার প্রতিটি লাইনই এক একটি প্যালিনড্রোম।

১ এর গুনে প্যালিন্ড্রমিক সংখ্যা

শুধু ১ এর সাথে ১ গুন করেও প্যালিন্ড্রমিক সংখ্যা পাওয়া যায়। নিচে লক্ষ্য কর। এভাবে n সংখ্যক ১ গুন করলেও গুনফল এ প্যালিন্ড্রমিক সংখ্যা আসবে। এটি ১ এর একটি বৈশিষ্ট্য।

১ X ১ = ১
১১ X ১১ = ১২১
১১১ X ১১১ = ১২৩২১
১১১১ X ১১১১ = ১২৩৪৩২১
১১১১১ X ১১১১১ = ১২৩৪৫৪৩২১
১১১১১১ X ১১১১১১ = ১২৩৪৫৬৫৪৩২১
১১১১১১১ X ১১১১১১১ = ১২৩৪৫৬৭৬৫৪৩২১
১১১১১১১১ X ১১১১১১১১ = ১২৩৪৫৬৭৮৭৬৫৪৩২১
১১১১১১১১১X১১১১১১১১১ = ১২৩৪৫৬৭৮৯৮৭৬৫৪৩২১

মৌলিক সংখ্যা

গণিতের পরিভাষায় মৌলিক সংখ্যা (অথবা মৌলিক) হল এমন প্রাকৃতিক সংখ্যা যার কেবলমাত্র দুটো পৃথক উৎপাদক আছে: ১ এবং ঐ সংখ্যাটি নিজে। ১ এর চেয়ে বড় সকল সংখ্যা যারা মৌলিক না তাদেরকে যৌগিক সংখ্যা বলে। পাটিগণিতের মৌলিক উপপাদ্য এর মাধ্যমে সংখ্যাতত্ত্বে মৌলিকের ভূমিকা প্রবেশ করানো হয়। ১ এর উপরে যেকোনো মৌলিক সংখ্যাকে ১ বাদে তার আগ পর্যন্ত সকল মৌলিক সংখ্যার গুনফল হিসাবে প্রকাশ করা যায়। কোনো সংখ্যার মৌলিকতা নির্ণয়ের সহজ কিন্তু ধীর পদ্ধতি হচ্ছে পরীক্ষামূলক ভাগ, যাতে দেখতে হয় সংখ্যা n, ২ থেকে শুরু করে n এর বর্গমূল পর্যন্ত কোনো দুইটি সংখ্যার গুনফল কিনা।

পরীক্ষামূলক ভাগের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরি পদ্ধতি হচ্ছে মিলার-রাবিন মৌলিকতা পরীক্ষা যা দ্রুত কিন্তু সামান্য সম্ভাবনা থাকে ভুলের এবং একেএস মৌলিকতা পরীক্ষা, যেটাতে সবসময়ে সঠিক উত্তর আসে বহুঘাত সময়ে, কিন্তু অনেক ধীর। বিশেষ রুপের মৌলিক সংখ্যার জন্য দ্রুতগতির পদ্ধতি আছে, যেমন মার্সেন সংখ্যাদের জন্য। আগস্ট ২০১৯ মোতাবেক, সর্ববৃহৎ মৌলিক সংখ্যাতে ২৩২৪৯২৫ টি অঙ্ক আছে। প্রথম ছাব্বিশটি মৌলিক সংখ্যা হল: ২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩, ১৭, ১৯, ২৩, ২৯, ৩১, ৩৭, ৪১, ৪৩, ৪৭, ৫৩, ৫৯, ৬১, ৬৭, ৭১, ৭৩, ৭৯, ৮৩, ৮৯, ৯৭, ১০১।৩ এর চেয়ে বড় প্রত্যেক মৌলিক সংখ্যার বর্গকে ১২ দ্বারা ভাগ করলে ১ অবশিষ্ট থাকে।

ইতিহাসঃ

মৌলিক সংখ্যা অসীমসংখ্যক, যা কিনা ইউক্লিড খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ সালের দিকে প্রমাণ করেন। সংজ্ঞানুসারে ১ সংখ্যাটি মৌলিক নয়। পাটীগণিতের মৌলিক উপপাদ্য সংখ্যাতত্ত্বে মৌলিক সংখ্যার কেন্দ্রীয় ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করে: যে কোন অশূণ্য প্রাকৃতিক সংখ্যা n কে মৌলিক সংখ্যা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা যায়, যা মৌলিক সংখ্যার গুণফল বা তাদের বিভিন্ন ঘাতের গুণফল হিসাবে (যার মধ্যে

শূণ্য ঘাতও রয়েছে)। আরও উল্লেখ্য, এই মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণের কাজটি কেবল একভাবেই করা যেতে পারে।

তথ্যপ্রযুক্তিতে বেশ কিছু শাখায় মৌলিক সংখ্যার ধারণার প্রয়োগ আছে, যেমন পাবলিক কী ক্রিপ্টোগ্রাফি, যা বড় সংখ্যাকে মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষিত করার জটিলতার সুযোগ নেয়। আবার কম্পিউটারে যৌথভাবে মৌলিক সংখ্যা খুঁজে বের করার প্রকল্প বিশেষ ধরণের মৌলিক সংখ্যা নিয়ে গবেষণা উস্কে দিয়েছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মার্জেন মৌলিক সংখ্যা, যার মৌলিকতা নির্ধারণ তুলনামূলকভাবে সহজতর। ২০০৯ সালের হিসাব অনুযায়ী জ্ঞাত সর্ববৃহৎ মৌলিক সংখ্যায় ১৩০ লক্ষ অঙ্ক আছে।

ইরাটস্থেনেস (২৭৬ খ্রিষ্টপূর্ব - ১৯৪ খ্রিষ্টপূর্ব) মৌলিক সংখ্যাগুলো বের করার একটা সহজ অ্যালগরিদম দিয়েছেন, সব সংখ্যাগুলোকে ছকে সাজিয়ে তার পর এক এক করে প্রথম সংখ্যাটিকে মৌলিক সংখ্যা হিসেবে চিহ্নিত করে তার সব গুণিতকগুলো কেটে দিতে হবে। উল্লেখ্য যে যদি ছকের কোন সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়া না থাকে তবে অ্যালগরিদমটি অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে (কারণ যে কোন সংখ্যার অসীম সংখ্যক গুণিতক থাকে)।

ম্যাট্রিক্স

গণিতে ম্যাট্রিক্স বলতে মূলত দুপাশে বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ বিভিন্ন নম্বরের একধরনের আয়তক্ষেত্রাকার বিন্যাসকে বুঝায় । যা বিশেষ কিছু নিয়মের অধীনে পরিচালিত হয় । তার মাঝে দুটি নিয়ম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ -

১. কিছু সমসত্ত্ব রৈখিক সমীকরণের সমষ্টির সহগ দ্বারা নির্ণয়যোগ্যতা
২. কিছু অসমসত্ত্ব রৈখিক সমীকরণের সমষ্টির আর্গুমেন্ট দ্বারা নির্ণয়যোগ্যতা

ম্যাট্রিক্সের সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায় আয়তাকারে সারি ও কলামে বা শুধু সারিতে বা শুধু কলামে সাজানো ও বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ সংখ্যাগোষ্ঠী একটি ম্যাট্রিক্স গঠন করে ।
একটি মেট্রিক্স কে তার সারি এবং কলাম সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

প্রকারভেদঃ

- **কলাম ম্যাট্রিক্স (Column Matrics)**
  (যে ম্যাট্রিক্সে একটি মাত্র কলাম থাকে)
  একে কলাম ভেক্টরও বলে।

- **সারি ম্যাট্রিক্স (Row Matrics)**
  (যে ম্যাট্রিক্সে একটি মাত্র সারি থাকে)
  একে সারি ভেক্টরও বলে ।

- **বর্গ (square) ম্যাট্রিক্স**
  (যে ম্যাট্রিক্সে কলাম ও সারির সংখ্যা সমান)
  অর্থাৎ যদি কোনো ম্যাট্রিক্স [aij]এর উপাদান এমন হয় যে i=j তবে তাকে বর্গ ম্যাট্রিক্স বলে ।

- **কর্ণ (diagonal) ম্যাট্রিক্স**

যদি কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্স উপাদানগুলোর মুখ্য (a11 উপাদান দিয়ে) কর্ণ ব্যতীত সকল উপাদানের মান শূন্য (০) হয় তবে তাকে কর্ণ ম্যাট্রিক্স বলে।

- **অভেদক (identity) বা একক ম্যাট্রিক্স (unit)**

একটি বর্গ ম্যাট্রিক্সের কর্ণ বরাবর উপাদানের মান ব্যতীত সকল উপাদান যদি শূন্য (০) হয় এবং কর্ণ বরাবর উপাদানের মান যদি এক(1) হয় তবে তাকে অভেদক ম্যাট্রিক্স বা একক ম্যাট্রিক্স বলে । সকল অভেদক ম্যাট্রিক্সই কর্ণ ম্যাট্রিক্স।

- **শূন্য ম্যাট্রিক্স (Zero Matrics)**

যখন কোনো ম্যাট্রিক্সের সকল উপাদানের মান শূন্য হয় তাকে শূন্য ম্যাট্রিক্স বলে। অর্থাৎ [aij] একটি শূন্য ম্যাট্রিক্স যখন aij=0 ।

- **প্রতিসম (Symmetric) ম্যাট্রিক্স**

যে অশূন্য বর্গ ম্যাট্রিক্সের সারি(গুলোকে) কলাম অথবা কলাম(গুলোকে) সারিতে রূপান্তরিত করলে একই ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় তাকে প্রতিসম ম্যাট্রিক্স বলে। অর্থাৎ [aij] একটি প্রতিসম ম্যাট্রিক্স যখন aij=aji।

- **বিপ্রতিসম (skew symmetric) ম্যাট্রিক্স**

যে বর্গ ম্যাট্রিক্সের সারি(গুলোকে) কলাম অথবা কলাম(গুলোকে) সারিতে রূপান্তরিত করলে ঐ ম্যাট্রিক্সের উপাদানের বিপরীত মান সংবলিত ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় তাকে বিপ্রতিসম ম্যাট্রিক্স বলে । অর্থাৎ [aij] একটি প্রতিসম মেট্রিক্স যখন aij = -aji ।

- **হার্মেশিয়ান (hermetian) ম্যাট্রিক্স**

কোনো ম্যাট্রিক্সের কোনো ভুক্তি জটিল মান হলে এর জটিল মান কে অনুবন্ধী করে ট্রান্সপোজ করলে আবার সেই ম্যাট্রিক্স ফিরে আসলে তাকে হার্মেশিয়ান ম্যাট্রিক্স বলে ।

- **স্কিউ হার্মেশিয়ান ম্যাট্রিক্স**

  কোনো ম্যাট্রিক্সের কোনো ভুক্তি জটিল মান হলে এর জটিল মান কে অনুবন্ধী করে ট্রান্সপোজ (সারি(গুলোকে) কলাম অথবা কলাম(গুলোকে) সারিতে রূপান্তরিত) করলে আবার বিপরীত মানের সেই ম্যাট্রিক্স ফিরে আসলে তাকে স্কিউ হার্মেশিয়ান ম্যাট্রিক্স বলে ।

ম্যাট্রিক্সের বীজগণিতঃ

যোগ

দুইটি m×n ম্যাট্রিক্স A এবং B, তাদের যোগ A+B একটি m×n ম্যাট্রিক্স হবে যা গণনা করা হয় সংশ্লিষ্ট উপাদান সমূহের যোগের মাধ্যমে
অর্থ্যাৎ , (A + B) [i, j] = A [i, j] + B [i, j]

গুণন

ম্যাট্রিক্স গুনন মুলত দুইটি ম্যাট্রিক্সের প্রথম ম্যাট্রিক্সের সারি এবং দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের কলামের মধ্য স্কেলার অপারেশন।
A ও B যদি দুটি ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে এদের গুনফল ম্যাট্রিক্স AB হবে A ম্যাট্রিক্সের সারি এবং B ম্যাট্রিক্সের কলামের ডট গুনফলের সমান

গুনন যোগ্যতা

যদি Am×n একটি m সংখ্যাক সারি এবং n সংখ্যাক কলাম বিশিষ্ট ম্যাট্রিক্স হয় এবং Bp×q একটি p সংখ্যাক সারি এবং q সংখ্যাক কলাম বিশিষ্ট ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে A এবং B ম্যাট্রিক্স দুটি গুননের যোগ্য হবে যদি এবং কেবল যদি n=p হয়। অর্থাৎ দুটি ম্যাট্রিক্স গুননের যোগ্যতা তখনই অর্জন করে যখন প্রথম ম্যাট্রিক্স এর কলাম সংখ্যা এবং দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের সারি সংখ্যা সমান হয়।

গুননে প্রাপ্ত ম্যাট্রিক্সের আকার

যদি A(m x n) একটি m সংখ্যাক সারি এবং n সংখ্যাক কলাম বিশিষ্ট ম্যাট্রিক্স হয় এবং B(p x q) একটি p সংখ্যাক সারি এবং q সংখ্যাক কলাম বিশিষ্ট ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে A এবং B ম্যাট্রিক্সটি গুনন যোগ্য হবে যদি যদি n=p হয় এবং গুনের পর ম্যাট্রিক্স AB পাওয়া গেলে এতে m সংখ্যাক সারি এবং q সংখ্যাক কলাম থাকবে। অর্থাৎ দুটি ম্যাট্রিক্সের গুনফল ম্যাট্রিক্সের সারি সংখ্যা হবে প্রথম ম্যাট্রিক্সের সারি সংখ্যার সমান এবং গুনফল ম্যট্রিক্সের কলাম সংখ্যা হবে দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের কলাম সংখ্যার সমান। AB ম্যাট্রিক্সের আকার হবে (mx q) অর্থাৎ এতে mসংখ্যাক সারি এবং q সংখ্যাক কলাম থাকবে।।

ম্যাট্রিক্সের স্কেলার গুনন

দুটি ম্যাট্রিক্সের গুন করার পাশাপাশি ম্যাট্রিক্সের সাথে অন্য কোন স্কেলার রাশিকেও গুন করা যায়। কোন ম্যাট্রিক্সকে যদি একটি স্কেলার রাশি দিয়ে গুন করা হয় তবে তা ম্যাট্রিক্সের সকল উপাদানের সাথে গুন হয়ে যাবে। অর্থাৎ একটি ৩ টি সারি এবং ৩টি কলাম বিশিষ্ট A ম্যাট্রিক্স কে যদি x দ্বারা গুন করা হয় তবে তা A ম্যাট্রিক্সের ৯ টি উপাদান বা ভুক্তির(উল্লেখ্য আধুনিক গনিতে উপাদানগুলোকে ভুক্তি নামে নামকরণ করা হয়েছে) সবার সাথে আলাদা আলাদা ভাবে গুন হয়ে যাবে।

প্যাসকেলের ত্রিভুজ

গণিতে, প্যাস্কেলের ত্রিভূজ-এর গুরুত্ব অপসীম। দ্বিপদী উপপাদ্য, ২ এর ঘাত যোগফলের অনুক্রম সহ বিভিন্ন গাণিতিক ধারার অভিব্যক্তি প্রকাশে সহায়তা করে। ফ্রান্স-এর গণিতবিদ, ব্লেইজ প্যাস্কেল-এর নাম অনুসারে এই ধারার নামকরন করা হয়েছে। প্যাস্কেলের ত্রিভূজে, উপরোক্ত সারির দুটি সংখ্যার যোগফলে অনুগামী সারির সংখ্যাগুলো নির্ণয় করা হয় এবং প্রথম পদ শূণ্য, পরের পদটি এক; এবং শেষ পদ শূণ্য ও তার আগের পদটি এক হয়।

প্রথমে, ধারাটির প্রথম লাইন ০-১-০ দিয়ে শুরু হয়। এর ঠিক নিচে পরের লাইটিতে, ০ দিয়ে ধারাটি শুরু হয়, যার পরবর্তী সংখ্যাটি প্রথম দুই পদের যোগফল, ০+১=১, এবং পরের পদটি শেষের দুই পদের যোগফল, ১+০=১; এবং শেষ পদটি ০ হয়। ফলে দ্বিতীয় লাইনটির হয়, ০-১-১-০। তৃতীয় লাইনের ক্ষেত্রে, প্রথম পদটি, দ্বিতীয় লাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় পদের যোগফল ০+১=১, দ্বিতীয় পদটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদের যোগফল ১+১=২, তৃতীয় পদটি তৃতীয় ও চতুর্থ পদের যোগফল ১+০=১; এবং শেষ পদটি ০ হয়, এবং লাইনটি হয় ০-১-২-১-০। এই ক্রম অনুসারে পরবর্তী লাইন গুলো চলতে থাকে।

$$১ = ২^{০}$$
$$১+১ = ২^{১}$$
$$১+২+১ = ২^{২}$$
$$১+৩+৩+১ = ২^{৩}$$
$$১+৪+৬+৪+১ = ২^{৪}$$
$$১+৫+১০+১০+৫+১ = ২^{৫}$$
$$১+৬+১৫+২০+১৫+৬+১ = ২^{৬}$$
$$১+৭+২১+৩৫+৩৫+২১+৭+১ = ২^{৭}$$
$$১+৮+২৮+৫৬+৭০+৫৬+২৮+৮+১ = ২^{৮}$$

এভাবে আজীবন চলতে থাকবে। প্যাসকেলের ত্রিভুজ এর একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। তাহলো প্রতিটি লাইনের সংখ্যা গুলো কে পরষ্পর যোগ করলে যোগফল কে $২^{৬}$ আকারে লিখা যায় যেখানে n হলো লাইন সংখ্যা ।

শূন্যের ইতিহাস

শূন্যকে (শ্যূন্য) কোন সংকেত বা প্রতীক হিসেবে ব্যবহার না-করে সরাসরি সংখ্যা হিসেবে সফলভাবে ব্যবহারের অবিমিশ্র কৃতিত্ব প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদদের। খৃষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীর দিকে ভারতে বাস্তব সংখ্যা দ্বারা হিসাব নিকাশ করার সময় শ্যূন্য ব্যবহৃত হত। এমনকি শ্যূন্যকে ব্যবহার করে যোগ, বিয়োগ, গুন ও ভাগও করা হত। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম থেকে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে ভারতীয় গণিতবিদ পিঙ্গলা "বাইনারি সংখ্যা" দিয়ে হিসাব-নিকাশ করার পদ্ধতি বের করেন। তিনি একটি ছোট অক্ষর এবং একটি বড় অক্ষরের সমন্বয়ে তা করতেন যা আধুনিক কালের মোর্স কোডের মত। তাঁর সমসাময়িক গণিতবিদরা সংস্কৃত শব্দ শ্যূন্যেয়া থেকে বাংলা শূন্য শব্দটি গ্রহণ করেন ।

ভারতীয় উপমহাদেশের গণিতবিদ আর্যভট্টের একটি বই-এ পাওয়া যায়, স্থানম স্থানম দশ গুণম।এখানে হয়তবা তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন, স্থানে স্থানে দশ গুণের কথা। তবে এখানেও শুন্যের কথা লুকায়িত ছিল। শেষ পর্যন্ত শুন্যকে সংখ্যার পরিচয় দেন ব্রহ্মগুপ্ত। তার ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত নামক বই-এ প্রথম শুন্যকে সংখ্যা হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়। শূন্যের সাথে যোগ , বিয়োগ , গুণের কথা এই বই-এ সঠিকভাবে দেয়া হয়। এছাড়া মহাবীর এবং ভাস্কর শুন্য নিয়ে কাজ করেন। তবে দুঃখের বিষয় এদের কেউ শুন্য দিয়ে কোন কিছু ভাগের কথা উল্লেখ করেনি ।

সোনালী অনুপাত

এবার গোল্ডেন রেশিও বা সোনালি অনুপাত নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। দুইটি সংখ্যার মধ্যে বৃহত্তর সংখ্যাটির সাপেক্ষে ঐ দুইটি সংখ্যার যোগফলের অনুপাত যদি ক্ষুদ্রতর সংখ্যার সাপেক্ষে বৃহত্তর সংখ্যার অনুপাতের সমান হয় তবে সংখ্যা দুইটি সোনালী অনুপাতে বিরাজমান। এটি দুটি সংখ্যার অনুপাত মাত্র, কিন্তু এই সংখ্যার উপস্থিতি পৃথিবীতে সম্ভবত সবথেকে আকর্ষণীয়! পৃথিবীতে আর কোনো সংখ্যা নিয়ে এতো গবেষণা হয়নি, যেটা গোল্ডেন রেশিও নিয়ে হয়েছে! গোল্ডেন রেশিও কে Φ (Phi) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। Φ (Phi) বলতে গেলে একটি দুষ্টু সংখ্যা। অন্যদের থেকে বেশ আলাদা। অমূলদ সংখ্যাগুলো আচরণের দিক থেকে একটু দুষ্টু হয় আরকি ! তাই Φ (Phi) এর মান ১.৬১৮০৩৩৯৮৮...... এর শেষ খুঁজতে যাওয়া আহাম্মকি ছাড়া আর কিছুই নয়!

গণিতবিদ ইউক্লিড তাঁর, ‘এলিমেন্টাস’ গ্রন্থে প্রথম Φ (Phi) এর জ্যামিতিক ব্যাখ্যা দেন। তিনি একটি রেখার উপর এমন একটি বিন্দু কল্পনা করেন, যাতে রেখাটি এমন ভাবে বিভক্ত হয় যে, ছোট অংশ ও বড় অংশের অনুপাত এবং বড় অংশ ও সম্পূর্ণ অংশের অনুপাত সর্বদা সমান। যার মান সর্বদা Φ (Phi) এর মানের সমান।

এখন যদি ছোট অংশের দৈর্ঘ্যকে ১ এবং বড় অংশ কে φ ধরা হয়, তবে সমীকরণটি দাঁড়াবে –

$$\frac{১}{\varphi} = \frac{\varphi}{১+\varphi}$$

সুতরাং $\varphi^{২} - \varphi - ১ = ০$

Quadratic formula অনুসরণ করে φ এর মান বের করতে গেলে পাই –

$$\varphi = (১ + \sqrt{৫}) \div ২ = ১.৬১৮০৩৩৯.....$$

আবার সমীকরণ টিকে যদি উল্টানো হয়,তাহলে আর একটি অদ্ভুত জিনিস Golden Ratio এর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। ব্যাপারটা একটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন। যেমন গোল্ডেন রেশিও এর মত আর একটি বিখ্যাত দুষ্টু সংখ্যা হল পাই (π)। যাকেও ২২/৭ ভগ্নাংশ আকারে লেখা সম্ভব। কিন্তু phi কে কখনোই ভগ্নাংশ আকারে লেখা সম্ভব নয়। যেটা সম্ভব, সেটা হল চলমান ভগ্নাংশ (Continuous Fraction) আকারে লেখা।

তাই বলা যায় φ (Phi) বা Golden Ratio অন্যান্য অমূলদ সংখ্যা হতে একটু বেশিই অমূলদ!

ফিবোনাচি ক্রম ও সোনালি অনুপাতের সম্পর্কঃ

সোনালি অনুপাতকে ফিবোনাচি ক্রমেরই একটা বিশেষ অংশ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। ব্যাপারটা এমন, যদি পর পর দুটি ফিবোনাচি সংখ্যার অনুপাত নেয়া হয়, তবে তার মান ক্রমান্বয়ে সোনালি অনুপাতের দিকেই যেতে থাকে এবং খুব দ্রুতই এই মান পুরোপুরি φ (Phi)এর মানের সমান হয়! যেমন, 55/34 = 1.617647 অথবা সংক্ষেপে 1.618.

মানবদেহে গোল্ডেন রেশিও এর উপস্থিতিঃ

লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চিকে (১৪৫২-১৫১৯) চেনে না, এমন মানুষ কমই পাওয়া যাবে। ধারণা করা হয়,তার শিল্প-কর্মে সবচেয়ে বেশি Golden Ratio এর উপস্থিতি পাওয়া যায়। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি মানব শরীরের ভিতরে এবং বাইরে Golden ratio এর উপস্থিতি বুঝতে পেরেছিলেন। এমনকি ডাক্তারদের চেম্বারে আমরা যে সব মানুষের অঙ্গের ছবি দেখে থাকি সেগুলো প্রথম ভিঞ্চিই ডিজাইন করেছিলেন।

এবার আসা যাক, ভিঞ্চি সাহেব কিভাবে মানবদেহে Golden Ratio এর উপস্থিতি বুঝতে পেরেছিলেন, সেই আলোচনায়। নারী বা পুরুষ সকল বয়সের মানুষের ক্ষেত্রেই, দেহের সম্পূর্ণ অংশের দৈর্ঘ্য ও নাভির নিচ থেকে বাকি অংশের দৈর্ঘ্যের অনুপাত φ (Phi) এর সমান। আবার কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং হাঁটু থেকে পায়ের আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত দূরত্বের অনুপাতও ১.৬১৮... (Phi)।মানুষের বাহু (বাইসেপ্স) এর সাথে সম্পূর্ণ হাত এর অনুপাতের মান হলো ১.৬১৮... (φ)। মানুষের আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে কনুই এর দৈর্ঘ্য এবং কবজি থেকে কনুই এর দৈর্ঘ্যের অনুপাত ১.৬১৮... (φ)। মানুষের মুখমণ্ডলের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ১.৬১৮... (φ)। ঠোঁটের দৈর্ঘ্য ও নাকের প্রস্থের অনুপাত , চোখের দুই প্রান্তের দূরত্বও চুল থেকে চোখের মনির দূরত্বও ১.৬১৮... (φ) ।সারা মুখমন্ডলের সবকিছুতে, শরীরের গিঁটে গিঁটে, মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরের অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে সবখানে এই φ(Phi) খুঁজে পাওয়া যাবে। গোটা মানবদেহে প্রায় তিন শতাধিক Golden Ratio (φ) খুঁজে পাওয়া যায়। মুখমণ্ডলেই পাওয়া যায় ৩০টিরও বেশি! চিত্রগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন, মানুষের চেহারায় কিভাবে Golden Rectangle এবং Golden Spiral পুরো খাপে খাপে বসে যায় ।

এছাড়াও লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) তাঁর বহু চিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রেও সোনালি অনুপাত ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে ভিট্রুভিয়ান ম্যান, দ্য লাস্ট সাপার, ও মোনালিসার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যার জন্য হয়তো মোনালিসার সেই মায়া জড়ানো মুচকি হাসি মানুষকে এখনো তাড়া করে ফেরে!
এছাড়া মাইকেল এঞ্জেলোর 'দ্য ক্রিয়েশন অফ অ্যাডাম', রাফায়েলের 'দ্য স্কুল অফ এথেন্স', বত্তিচেল্লির 'দ্য বার্থ অফ ভিনাস', সালভাদর দালির 'দ্য স্যাক্রামেন্ট অফ দি লাস্ট সাপার'- ইত্যাদি বিখ্যাত সব চিত্রকর্মে গোল্ডেন রেশিওর ব্যবহার দেখা যায় ।

৪৬৪ এর অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য

৪৬৪ এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে যা সব সংখ্যার ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না।

১. ৪৬৪ এর বর্গ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তার অংক গুলো যোগ করে একটি বর্গ সংখ্যা পাওয়া যায়।
   যেমন : ৪৬৪^2=২১৫২৯৬=২+১+৫+২+৯+৬=৫^2

২. ৪৬৪ একটি প্যালিন্ড্রমিক সংখ্যা অর্থাৎ একে যদি আমরা উল্টো করে লিখি তবে আবার ৪৬৪ ই ফিরে আসে।

৩. ৪৬৪ কে ১১^2+৭^3 আকারে প্রকাশ করা যায় ।

৪. ৪৬৪ কে ২০^2+৪^3 আকারে প্রকাশ করা যায় ।

৫. ৪৬৪ কে ৪^3+২^2+৬^2+৮^2+১০^2+১৪^2 আকারে প্রকাশ করা যায় ।

অদ্ভুত সংখ্যা ৭৬৯২৩ (পর্ব-১)

৭৬৯২৩ একটি অদ্ভুত সংখ্যা। এটাকে বৃত্ত সংখ্যা ও বলা হয়। কারণ গুনফল গুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন প্রতিটি গুনফলে ৭, ৬, ৯, ২, ৩, ০ এর বাইরে কোন অংক নেই এবং সেগুলোই বার বার ঘুরছে। গুনফলে প্রতিটা অংক কোনা কুনি ভাবে অবস্থান করছে।

৭৬৯২৩ × ১ = ০৭৬৯২৩
৭৬৯২৩ × ১০ = ৭৬৯২৩০
৭৬৯২৩ × ৯ = ৬৯২৩০৭
৭৬৯২৩ × ১২ = ৯২৩০৭৬
৭৬৯২৩ × ৩ = ২৩০৭৬৯
৭৬৯২৩ × ৪ = ৩০৭৬৯২

অদ্ভুত সংখ্যা ৭৬৯২৩ (পর্ব-২)

পর্ব ১ এ দেখলাম এটা একটা বৃত্ত সংখ্যা। এখানেও দেখবো বৃত্ত সংখ্যার আরেক রুপ। পর্ব ১ এ গুনফল এ ৭৬৯২৩ সংখ্যাটিই পেয়েছি কিন্তু এখানে ১৫৩৮৪৬ পেয়েছি। লক্ষ্য করলে দেখবেন এটিও বৃত্ত সংখ্যার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে।

৭৬৯২৩ × ২ = ১৫৩৮৪৬
৭৬৯২৩ × ৭ = ৫৩৮৪৬১
৭৬৯২৩ × ৫ = ৩৮৪৬১৫
৭৬৯২৩ × ১১ = ৮৪৬১৫৩
৭৬৯২৩ × ৬ = ৪৬১৫৩৮
৭৬৯২৩ × ৮ = ৬১৫৩৮৪

অদ্ভুত সংখ্যা ১৪২৮৫৭ (পর্ব-৩)

১৪২৮৫৭ এটিও বৃত্ত সংখ্যার বৈশিষ্ট্য বহন করে। এটি প্রাকৃতিক ভাবেই বৃত্ত সংখ্যা। পুর্বের গুলো বিভিন্ন ভাবে খুন করে মেলানো হয়েছে কিন্তু এটি ক্রমান্বয়ে গুন করেই পাওয়া গেছে বৃত্ত সংখ্যার বৈশিষ্ট্য। আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো লিখলাম না। ভালো করে লক্ষ্য করলে নিজেই বুঝতে পারবেন।

১৪২৮৫৭ × ১ = ১৪২৮৫৭
১৪২৮৫৭ × ৩ = ৪২৮৫৭১
১৪২৮৫৭ × ২ = ২৮৫৭১৪
১৪২৮৫৭ × ৬ = ৮৫৭১৪২
১৪২৮৫৭ × ৪ = ৫৭১৪২৮
১৪২৮৫৭ × ৫ = ৭১৪২৮৫

আবার গুনফল গুলোকে ৭ দিয়ে গুন করলে পাবেন অসাধারণ কিছু মজাদার সংখ্যা। আসলেই গনিতের কত রুপ বৈচিত্র্য, কত বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে আছে তাইনা?

১৪২৮৫৭ × ৭ = ০৯৯৯৯৯৯
৪২৮৫৭১ × ৭ = ২৯৯৯৯৯৭
২৮৫৭১৪ × ৭ = ৩৯৯৯৯৯৬
৮৫৭১৪২ × ৭ = ৪৯৯৯৯৯৫
৫৭১৪২৮ × ৭ = ৫৯৯৯৯৯৬
৭১৪২৮৫ × ৭ = ৬৯৯৯৯৯৩

১৯ এর কারসাজি

১৯ এর বৈশিষ্ট্য গুলো দেখলে হয়তো বিশ্বাস ই করবেন না যে গনিত এত মজার এত আনন্দময় হতে পারে। ১৯ এর গুনফল গুলোর দিকে তাকালে দেখবেন ক্রমান্বয়ে ১ থেকে ১৭ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা আছে। তারপরেই আছে উল্টো ক্রমে ৯ থেকে ১ পর্যন্ত অংক। গুনফল গুলো পরষ্পরের সাথে যোগ করলে আবার পাবেন ১০ থেকে ১৮ পর্যন্ত সংখ্যা।

১৯ × ১ = ১৯ = ১+৯ = ১০
১৯ × ২ = ৩৮ = ৩+৮ = ১১
১৯ × ৩ = ৫৭ = ৫+৭ = ১২
১৯ × ৪ = ৭৬ = ৭+৬ = ১৩
১৯ × ৫ = ৯৫ = ৯+৫ = ১৪
১৯ × ৬ = ১১৪ = ১১+৪ = ১৫
১৯ × ৭ = ১৩৩ = ১৩+৩ = ১৬
১৯ × ৮ = ১৫২ = ১৫+২ = ১৭
১৯ × ৯ = ১৭১ = ১৭+১ = ১৮

আরো একটি মজার ব্যাপার হলো

$$১৯ \times ১ = ১৯$$
$$১৯ \times ২ = ৩৮$$
$$১৯ \times ৩ = ৫৭$$
$$১৯ \times ৪ = ৭৬$$
$$১৯ \times ৫ = ৯৫$$
$$১৯ \times ৬ = ১১৪$$
$$১৯ \times ৭ = ১৩৩$$
$$১৯ \times ৮ = ১৫২$$
$$১৯ \times ৯ = ১৭১$$

গুনফলের দিকে লক্ষ্য করলে দেখবেন প্রথম অংক গুলো আসলে উপর থেকে নিচে ১ থেকে ১৭ পর্যন্ত বেজোড় সংখ্যা এবং উপর থেকে নিচে দ্বিতীয় অংক ৯ থেকে ক্রমান্বয়ে কমতে কমতে ১ পর্যন্ত গিয়েছে।

৯১০৯ এর জটিল রহস্য

৯১০৯ এর মধ্যে খুব বেশি বৈশিষ্ট্য না থাকলেও এখানে কিছু আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য আছে। চলুন দেখে নিই

	A	B	C	D	E
৯১০৯ × ১ =	০	৯	১	০	৯
৯১০৯ × ২ =	১	৮	২	১	৮
৯১০৯ × ৩ =	২	৭	৩	২	৭
৯১০৯ × ৪ =	৩	৬	৪	৩	৬
৯১০৯ × ৫ =	৪	৫	৫	৪	৫
৯১০৯ × ৬ =	৫	৪	৬	৫	৪
৯১০৯ × ৭ =	৬	৩	৭	৬	৩
৯১০৯ × ৮ =	৭	২	৮	৭	২
৯১০৯ × ৯ =	৮	১	৯	৮	১

এখানে গুনফল গুলোর দিকে তাকালে দেখবেন A কলামে রয়েছে পর্যায়ক্রমে ০ থেকে ৮ পর্যন্ত। B কলামে রয়েছে উল্টো ক্রমে ৯ থেকে ১ পর্যন্ত, C কলামে ১ থেকে ৯ , D কলামে ০ থেকে ৮ ও E কলামে ৯ থেকে ১ পর্যন্ত অংক। এছাড়া দেখুন A, B ও D, E কলাম একই রকম।

যোগফল থেকে বর্গ

বেজোড় সংখ্যা ও বর্গের মধ্যে একটি অসাধারণ মিল রয়েছে। প্রথম দুইটি বেজোড় সংখ্যার যোগফল ২ এর বর্গের সমান। আবার প্রথম তিনটি বেজোড় সংখ্যার যোগফল ৩ এর বর্গের সমান।

$১+৩ = ২^2$

$১+৩+৫ = ৩^2$

$১+৩+৫+৭ = ৪^2$

$১+৩+৫+৭+৯ = ৫^2$

$১+৩+৫+৭+৯+১১ = ৬^2$

$১+৩+৫+৭+৯+১১+১৩ = ৭^2$

$১+৩+৫+৭+৯+১১+১৩+১৫ = ৮^2$

$১+৩+৫+৭+৯+১১+১৩+১৫+১৭ = ৯^2$

$১+৩+৫+৭+৯+১১+১৩+১৫+১৭+১৯ = ১০^2$

এভাবে আজীবন গননা করতে থাকলেও এর শেষ হবে না। এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া। যতক্ষণ বেজোড় সংখ্যা থাকবে ততক্ষণ এটা চলতে থাকবে।

ঘন ও বর্গের সম্পর্ক

ঘন ও বর্গের মধ্যে রয়েছে অদ্ভুত সম্পর্ক। এই সম্পর্কের সাধারণ গঠন হলো

$$n^3 + (n+1)^3 + (n+2)^3\ldots = \{n + (n+1) + (n+2)\ldots\}^2$$

$১^3 = ১^2$

$১^3 + ২^3 = (১+২)^2$

$১^3 + ২^3 + ৩^3 = (১+২+৩)^2$

$১^3 + ২^3 + ৩^3 + ৪^3 = (১+২+৩+৪)^2$

$১^3 + ২^3 + ৩^3 + ৪^3 + ৫^3 = (১+২+৩+৪+৫)^2$

$১^3 + ২^3 + ৩^3 + ৪^3 + ৫^3 + ৬^3 = (১+২+৩+৪+৫+৬)^2$

$১^3 + ২^3 + ৩^3 + ৪^3 + ৫^3 + ৬^3 + ৭^3 = (১+২+৩+৪+৫+৬+৭)^2$

....

এভাবে আজীবন চলতে থাকবে । এর কোন শেষ নেই । বিশ্বাস না হলে করে দেখতে পারো ।

ম্যাজিক ফ্যাক্টোরিয়াল

আমরা কম বেশি সবাই ফ্যাক্টোরিয়াল চিনি। একটি সংখ্যার গৌণিক বা ফ্যাক্টরিয়াল হলো সংখ্যাটির সমান বা তার থেকে ছোট সকল ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার গুণফল। n -এর গৌণিককে "n!" দ্বারা প্রকাশ করা হয় ।

সুতরাং, $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times (n-3)...$

এই ফ্যাক্টোরিয়াল এর মাঝেও কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যা গনিতপ্রেমিদের মুগ্ধ করে তোলে ।

১x১! = ২!-১

১x১! + ২x২! = ৩!-১

১x১! + ২x২! + ৩x৩! = ৪!-১

১x১! + ২x২! + ৩x৩! +৪x৪! = ৫!-১

১x১! + ২x২! + ৩x৩! +৪x৪! + ৫.৫! = ৬!-১

১০৮৯ এর রহস্য

এখানে গুনফল গুলোর দিকে তাকালে দেখবেন A কলামে রয়েছে পর্যায়ক্রমে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত । B কলামে রয়েছে উল্টো ক্রমে ০ থেকে ৮ পর্যন্ত, C কলামে ৮ থেকে ০ , D কলামে ৯ থেকে ১ পর্যন্ত অংক রয়েছে ।

	ABCD	DCBA	
১০৮৯ × ১ =	১ ০ ৮ ৯	৯ ৮ ০ ১	(×৯)
১০৮৯ × ২ =	২ ১ ৭ ৮	৮ ৭ ২ ১	(×৮)
১০৮৯ × ৩ =	৩ ২ ৬ ৭	৭ ৬ ৩ ২	(×৭)
১০৮৯ × ৪ =	৪ ৩ ৫ ৬	৬ ৫ ৩ ৪	(×৬)
১০৮৯ × ৫ =	৫ ৪ ৪ ৫	৫ ৪ ৪ ৫	(×৫)
১০৮৯ × ৬ =	৬ ৫ ৩ ৪	৪ ৩ ৫ ৬	(×৪)
১০৮৯ × ৭ =	৭ ৬ ২ ৩	৩ ২ ৬ ৭	(×৩)
১০৮৯ × ৮ =	৮ ৭ ১ ২	২ ১ ৭ ৮	(×২)
১০৮৯ × ৯ =	৯ ৮ ০ ১	১ ০ ৮ ৯	(×১)

গুনফল গুলোকে উল্টো করে লিখলেও আবার গুনফল গুলোয় ফিরে আসে। এই বৈশিষ্ট্য শুধু ১০৮৯ এর ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়।

১ এর সাম্রাজ্য

এ যেন ১ এর ছড়াছড়ি। শুধু ১ আর ১ । এটাই তো মজার গনিত। যে গনিত দেখে ভয় পায় শিক্ষার্থীরা সেই গনিতেই লুকিয়ে আছে হাজারো রহস্য। তবুও আমরা গনিত কে ভালোবাসতে পারি না ।

০ × ১ + ১ = ১

১ × ৯ + ২ = ১১

১২ × ৯ + ৩ = ১১১

১২৩ × ৯ + ৪ = ১১১১

১২৩৪ × ৯ + ৫ = ১১১১১

১২৩৪৫ × ৯ + ৬ = ১১১১১১

১২৩৪৫৬ × ৯ + ৭ = ১১১১১১১

১২৩৪৫৬৭ × ৯ + ৮ = ১১১১১১১১

১২৩৪৫৬৭৮ × ৯ + ৯ = ১১১১১১১১১

৮ এর সাম্রাজ্য

১ এর মতো ৮ এর ও রয়েছে নিজস্ব সাম্রাজ্য। হয়তো রয়েছে প্রতিটি অংকের। চলো আপাতত হায় ৮ এর জগতে।

$৯ \times ০ + ৮ = ৮$

$৯ \times ৯ + ৭ = ৮৮$

$৯৮ \times ৯ + ৬ = ৮৮৮$

$৯৮৭ \times ৯ + ৫ = ৮৮৮৮$

$৯৮৭৬ \times ৯ + ৪ = ৮৮৮৮৮$

$৯৮৭৬৫ \times ৯ + ৩ = ৮৮৮৮৮৮$

$৯৮৭৬৫৪ \times ৯ + ২ = ৮৮৮৮৮৮৮$

$৯৮৭৬৫৪৩ \times ৯ + ১ = ৮৮৮৮৮৮৮৮$

$৯৮৭৬৫৪৩২ \times ৯ + ০ = ৮৮৮৮৮৮৮৮৮$

$৯৮৭৬৫৪৩২১ \times ৯ - ১ = ৮৮৮৮৮৮৮৮৮৮$

১ + ১ = ২ প্রমাণিত

গণিত, এমন একটা বিষয় যা আমাদের জীবনের সব কিছুর সাথেই সম্পর্কিত। এজন্য গণিতের প্রতি আমাদের ভালোবাসাও অনেক বেশি। এটি যেমন কিছু ক্ষেত্রে অনেক সহজ তেমনি এতে রয়েছে অনেক রহস্য। গণিত নিয়ে আছে অনেক মজার মজার কৌতুক, ধাঁধাঁ। আছে নানান ধরনের খেলা কিংবা মাইন্ড রিডিং গেম ।

যাক, আর বেশি কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি আমাদের মূল প্রসঙ্গে ।

কেমন হয় যদি, প্রমান করতে পারেন ১ এর সাথে ১ যোগ করলে ১ হয় ? ভাবছেন কীভাবে সম্ভব ? সম্ভব ! চলুন আমার সাথে ।

প্রথমে, আমরা ধরে নিচ্ছি,

→ $x = y =$ ১ তাহলে,

→ $x = y$

→ $x^2 = xy$ [উভয় পক্ষকে x দিয়ে গুন করে পাই]

→ $x^2 - y^2 = xy - y^2$. [উভয় পক্ষে $-y^2$ যোগ করে পাই]

→ $(x+y)(x-y) = y(x-y)$

→ $x+y = y$ [উভয়পক্ষে $(x-y)$ দ্বারা ভাগ করে পাই]

→ ১+১ = ১ [মান গুলো বসিয়ে পাই]

সুতরাং প্রমাণিত হলো ১ সাথে ১ যোগ করলে ১ হয় !!

(***বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ*** গণিতে এমনটি সম্ভব নয়। যদি না আমরা ভুল না করি। এখানেও একটা ট্রিক্স খুব সুক্ষ্ম ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু ৯০% এর বেশি মানুষ এই ভুলটি ধরতে পারে না।)

০ ÷ ০ = ২ প্রমাণ

বামপক্ষ = ০÷ ০

= ২৫ - ২৫ ÷ ২৫ - ২৫

= ৫^2 - ৫^2 ÷ ৫ (৫-৫)

= (৫+৫) (৫-৫) ÷ ৫ (৫-৫)

= (৫+৫) ÷ ৫

= ২ = ডানপক্ষ

সুতরাং প্রমাণিত যে, ০ ÷ ০ = ২

(***বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ*** গণিতে এমনটি সম্ভব নয় । যদি না আমরা ভুল না করি । এখানেও একটা ট্রিক্স খুব সুক্ষ্ম ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে । এখানে ৩য় লাইনে ৫ কমন নেয়ার ফলে হরে শুন্য হয়ে গেছে যা ∞ ফরম এ চলে এসেছে ।)

রহস্যময় ৬১৭৪

৬১৭৪ সংখ্যাটিকে ভারতীয় গণিতবিদ ডি. আর. কাপরেকারের নামানুসারে কাপেরেকার ধ্রুবক বলা হয়।

নিম্নবর্ণিত কারণগুলোর জন্য সংখ্যাটি উল্লেখযোগ্য:

১. চার অঙ্কের একটি সংখ্যা নিন, যাতে দুইটি আলাদা অঙ্ক থাকবে (শূন্যসহ)

২. সংখ্যাটিকে উল্টোকরে বড় থেকে ছোট সাজান । এরপর সংখ্যাটিকে পুনরায় উল্টোকরে সাজান।

৩. প্রাপ্ত দুইটি সংখ্যার বড়টি থেকে ছোটটি বিয়োগ করুন।

৪. আবার ২ নং প্রক্রিয়ায় ফিরে যান ও বাকি প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করুন।

এই প্রক্রিয়া কাপরেকারের চক্র নামে পরিচিত। এই প্রক্রিয়ায় একসময় মান ৬১৭৪ আসবে, যাতে পৌঁছাতে প্রক্রিয়া সর্বোচ্চ ৭ বার করা লাগবে। ৬১৭৪ এ পৌঁছানোর পর প্রক্রিয়াটি পুনরায় চালালে ৬১৭৪ ব্যতীত আর কোন মান আসবে না। উদাহরণস্বরূপ, ৩৫২৪ সংখ্যাটিকে ধরা যাক:

৫৪৩২ – ২৩৪৫ = ৩০৮৭
৮৭৩০ – ০৩৭৮ = ৮৩৫২
৮৩৫২ – ২৩৫৮ = ৬১৭৪
৭৬৪১ – ১৪৬৭ = ৬১৭৪

চার অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যার মাঝে চারটি অঙ্ক এক থাকা সংখ্যা (যেমন, ১১১১, ২২২২) ব্যতীত সব ক্ষেত্রেই কাপরেকার চক্র অনুসরণ করলে এক সময়ে ৬১৭৪ আসবে ।

অন্যান্য কাপরেকার ধ্রুবকঃ

তিন অঙ্কের সংখ্যার ক্ষেত্রেও এমন ঘটনার নজির দেখা যায় । সেক্ষেত্রে, কাপরেকার চক্র সর্বোচ্চ ৬ ধাপ অনুসরণ করলে মান দাঁড়ায় ৪৯৫। তবে ১১১, ২২২ ইত্যাদি একই বিশিষ্ট তিন অঙ্কের সংখ্যার ক্ষেত্রে এ নজির দেখা যায় না। কখনো কখনো ৪৯৫ ও ৬১৭৪ এর মত এসব পুনরাবৃত্তিক সংখ্যাদের "কাপরেকার ধ্রুবক" বলা হয়ে থাকে।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্যঃ

৬১৭৪ হল হর্ষদ সংখ্যা, কেননা এটি এর অঙ্কগুলোর সমষ্টি
(৬+১+৭+৪ = ১৮, ৬১৭৪ ÷ ১৮ = ৩৪৩) দ্বারা বিভাজ্য।
৬১৭৪ হল ৭-মসৃণ সংখ্যা কেননা, এর মৌলিক উৎপাদকগুলো ৭ অপেক্ষা বড় নয় । ৬১৭৪ কে ১৮ এর তিনটি ঘাতের যোগফল হিসেবে লেখা যায়:
১৮৩ + ১৮২ + ১৮১ = ৫৮৩২ + ৩২৪ + ১৮ = ৬১৭৪

৬১৭৪ (২×৩×৩×৭×৭×৭) সংখ্যাটিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাওয়া মৌলিক উৎপাদকগুলো অঙ্কের বর্গের সমষ্টি একটি বর্গসংখ্যা:

২২ + ৩২ + ৩২ + ৭২ + ৭২ + ৭২
= ৪ + ৯ + ৯ + ৪৯ + ৪৯ + ৪৯
= ১৬৯
= ১৩২

বিস্তারিতঃ

প্রথম দেখায় খুব বেশি কিছু হয়তো মনে হবেনা—কিন্তু এটাই গণিতবিদ ও সংখ্যা বা নাম্বার নিয়ে উৎসাহীদের আকর্ষণ করে আসছে সেই ১৯৪৯ সাল থেকে কেন ? নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন না কেন ?

১. চার অংকের একটি সংখ্যা নিন যেখানে অন্তত দুটি ভিন্ন ডিজিট থাকবে (শূন্য সহ)। যেমন ধরুন ১২৩৪।

২. এগুলো উল্টো (বড় থেকে ছোটো) করে সাজান : যেমন ৪৩২১

৩. এখন ক্রমানুসারে করে সাজান: ১২৩৪

৪. এবার বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা বিয়োগ দিন: ৪৩২১-১২৩৪

৫. এখন বিয়োগের ফল নিয়ে স্টেপ ২,৩ ও ৪ পুনরাবৃত্তি করুন

চলুন এক সাথে করি

- ৪৩২১ - ১২৩৪ = ৩০৮৭
- বড় থেকে ছোটো করে সাজান: ৮৭৩০
- ক্রমানুসারে: ০৩৭৮
- বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা বিয়োগ দিন: ৮৭৩০-০৩৭৮= ৮৩৫২
- এখন বিয়োগের ফল নিয়ে আগের তিনটি ধাপ পুনরাবৃত্তি করুন
  এখন যে সংখ্যা নিয়ে কাজ চলছে তা হলও ৮৩৫২
- ৮৫৩২ - ২৩৫৮ = ৬১৭৪
  এবং ৬১৭৪ নিয়ে পুনরাবৃত্তি করুণ- এর ডিজিট গুলো বড় থেকে ছোটো ও ছোটো থেকে বড়ো করে , এবং বিয়োগ করে
- ৭৬৪১ - ১৪৬৭ = ৬১৭৪

দেখতেই পাচ্ছেন প্রতিবার একই কাজে আপনি একই ফলাফল পাচ্ছেন: ৬১৭৪
আচ্ছা, আপনি হয়তো ভাবছেন এটা কাকতালীয় । তাহলে অন্য যে কোনো সংখ্যা নিয়ে চেষ্টা করুন । ২০05 কেমন হয় ?

- ৫২০০-০০২৫ = ৫১৭৫
- ৭৫৫১-১৫৫৭=৫৯৯৪
- ৯৯৫৪-৪৫৯৯=৫৩৫৫
- ৫৫৫৩-৩৫৫৫=১৯৯৮
- ৯৯৮১-১৮৯৯=৮০৮২
- ৮৮২০-০২৮৮=৮৫৩২
- ৮৫৩২-২৩৫৮=৬১৭৪
- ৭৬৪১-১৪৬৭=৬১৭৪

কোন চারটি সংখ্যা বা নাম্বার আপনি নিলেন সেটি কোনো ব্যাপার না, যখনই আপনি ৬১৭৪ এ পৌঁছবেন তারপর থেকে একই কাজে আপনি এই ফলই পাবেন ।

কাপরেকার'স কন্সট্যান্টঃ

ভারতীয় গণিতবিদ দত্তত্রেয়া রামচন্দ্র কাপরেকার (১৯০৫-১৯৮৬) সংখ্যা নিয়ে খেলতে ভালোবাসতেন। ড. আর কাপরেকার ১৯৪৯ সালে মাদ্রাজে এক গণিত সম্মেলনে বিশ্বকে তার উদ্ভাবন সম্পর্কে জানিয়েছেন । তিনি মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেছেন এবং মুম্বাইয়ের উত্তরের পাহাড়ি এলাকা দেবলালি শহরে স্কুল শিক্ষক হিসেবে জীবন কাটিয়েছেন । তার অনেক আবিষ্কারই ভারতীয় গণিতবিদদের অনেকে উড়িয়ে দিয়েছেন, যারা তার কাজকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করতেন । তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন চিন্তাশীল লেখক, বিশেষ করে জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রকাশনাগুলোতে । তিনি প্রায়শই নানা সম্মেলন বা স্কুল কলেজে তার উদ্ভট মেথড এবং আগ্রহ উদ্দীপক সংখ্যা পর্যবেক্ষণ নিয়ে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রিত হতেন। ধীরে ধীরে কাপরেকারের ধারণা দেশে বিদেশে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করে সত্তরের দশকে । আমেরিকান বেস্ট সেলার লেখক ও গণিত ভক্ত মার্টিন গার্ডনার জনপ্রিয় বিজ্ঞান সাময়িকী সায়েন্টিফিক আমেরিকাতে তাকে নিয়ে লেখেন । এখন কাপরেকার ও তার আবিষ্কারগুলো স্বীকৃত এবং বিশ্বজুড়ে গণিতবিদদের দ্বারা সমাদৃত । বিশেষ করে তাদের কাছে যারা সংখ্যা নিয়ে খেলা থেকে বিরত থাকতে পারেননা। ওসাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ইয়ুতাকা নিশিয়ামা বলছেন, "৬১৭৪ সংখ্যাটি সত্যিই এক রহস্যময় নাম্বার"। একটি অনলাইন ম্যাগাজিনে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি কিভাবে কম্পিউটারের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে সব চারটি ডিজিটই শেষ পর্যন্ত ৬১৭৪ এ পৌঁছায় কি-না ।
তিনিও দেখেছেন যে, প্রতি চারটি নাম্বার (যেখানে ডিজিটগুলো একই নয়) কারপেকারের পদ্ধতিতে সাতটি ধাপে গিয়ে ৬১৭৪-এই পৌঁছায় ।
নিশিয়ামার মতে, "কারপেকারের সাত ধাপে যদি আপনি ৬১৭৪ এ না পৌঁছান তাহলে বুঝবেন আপনার কোথাও ভুল হয়েছে । তাহলে আবার চেষ্টা করুন"।

ম্যাজিক নাম্বারঃ

এমন আর কয়টি বিশেষ সংখ্যা আছে ? এর উত্তর হল আমরা নিশ্চিত করে জানিনা। কিন্তু আমরা জানি তিন ডিজিট নিয়ে একই ধরণের কাপরেকার কনস্ট্যান্ট আছে।
সেগুলো দেখা যাক।
আমরা যে কোনো তিনটি ডিজিট নিয়ে শুরু করতে পারি, যেমন ৫৭৪:

- ৭৫৪-৪৫৭=২৯৭
- ৯৭২-২৭৯=৬৯৩
- ৯৬৩-৩৬৯=৫৯৪
- ৯৫৪-৪৫৯= ৪৯৫
- ৯৫৪-৪৫৯=৪৯৫

তাহলে এখানে একটি ম্যাজিক নাম্বার পাওয়া গেলো এবং তা হলও ৪৯৫
গণিতবিদরা বলছেন, এই ফ্যাক্টরটি কাজ করে তিন বা চার ডিজিটের ক্ষেত্রে কিন্তু তারা শুধু খেলেছেন দুই থেকে দশ ডিজিট নিয়ে।

৬১৭৪ যখন টেকনিকালারেঃ

সিগ্রাম টেকনোলজিস ফাউন্ডেশন মুম্বাই ভিত্তিক একটি ভারতীয় কোম্পানি এবং তারা গ্রামীণ ও আদিবাসী স্কুলগুলোর জন্য আইটি লার্নিং প্লাটফরম প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা সিদ্ধান্ত নিলো নিয়ে ৬১৭৪ সংখ্যা দিয়ে তারা ডিজিট ও কালার নিয়ে খেলবে। এর প্রতিষ্ঠাতা গিরিশ আরাবেইল বিবিসিকে বলেন, অংক অপছন্দ করে এমন শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করতেই তারা এর মজাটি দেখাতে চেয়েছেন। "কাপরেকার ধারাবাহিক চমৎকার একটি সৌন্দর্য," বলছেন আরাবেইল। "আপনি যখন ধাপগুলো অনুসরণ করবেন, এটা আপনাকে দারুণ মুহূর্তের দিকে নিয়ে যাবে। প্রচলিত গণিত সিলেবাসে যেটা সচরাচর পাওয়া যায়না"। আরবেইলের দল পরে ৬১৭৪ এ পৌঁছানোর জন্য কালার কোড সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়।যা ম্যাজিক নাম্বারে পৌছাঁতে সাত ধাপের বেশি সময় নেয়না। কম্পিউটারে বিশেষ ভাষা অনুসরণ করে শিক্ষার্থীরা এটির ব্যখ্যা করতে পারে। এবং প্রচলিত প্রায় দশ হাজার চার ডিজিটি সংখ্যা দিয়ে প্রোগ্রাম চালাতে পারে। বহু রংয়ের গ্রিড ব্যবহার করে ম্যাজিক নাম্বারে পৌঁছানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে।

আনন্দময় গণিতঃ

'কাপরেকার কনস্ট্যান্ট' গণিতকে আনন্দময় করতে তার একমাত্র অবদান নয়। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন কারপেকার নাম্বার: একটি ইতিবাচক সংখ্যা স্কয়ার করলে পরে তাকে দুভাগে আলাদা করতে তার ফল আসে মূল সংখ্যাটাই। যেমন :

- ২৯৭^2= ৮৮,২০৯
- ৮৮+২০৯= ২৯৭

কাপরেকার সংখ্যার আরেকটি ভালো উদাহরণ হলো :
৯, ৪৫, ৫৫, ৯৯, ৭০৩, ৯৯৯, ২,২২৩, ১৭, ৩৪৪, ৫৩৮, ৪৬১......
এভাবে চেষ্টা করুন নিজে এবং দেখুন কি হয়।
মনে রাখবেন আপনি যখন রেজাল্টিং নাম্বারকে ভাগ করবেন তখন এক ডিজিটের সাথে এক ডিজিট এবং দুই ডিজিটের সাথে দুই ডিজিট নেয়ার চেষ্টা করবেন।

আর যদিও দু ভাগে ভাগ না করা যায় (যেমন ৮৮,২০৯) তাহলে প্রথমে দুটি ডিজিট ও পরে তিনটি ডিজিট নিবেন । এবং এতকিছুর পর নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন আপনি যা করছেন তাই কাপরেকার অপারেশন কি-না । এখন আসলে আপনি নিজেই আনন্দময় গণিতের একজন বিশেষজ্ঞ।

০.৯৯৯৯... থেকে ১

০.৯৯৯... একটি পৌনঃপুনিক দশমিক সংখ্যা যা একটি বাস্তব সংখ্যাকে নির্দেশ করে।নির্দিষ্টভাবে এই সংখ্যাটিকে ১ -এর সমান ধরা হয়। অর্থাৎ ০.৯৯৯... সংখ্যাটি সংখ্যাগত দিক দিয়ে ১ -কেই নির্দেশ করে। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে গণিতের বিভিন্ন শাখায় অনেকগুলো প্রামাণিক উপপাদ্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বীজগাণিতিক প্রমাণঃ

ধরা যাক $x = 0.999.....$

তাহলে, $10x = 9.999.....$

বা, $(10x - x) = (9.999.... - 0.999....)$

বা, $9x = 9$

অতঃপর নিশ্চিতভাবেই $x= 1.$

অর্থাৎ, 0.999... মানে প্রায় 1 নয় ! একেবারে কাটায় কাটায় 1.

ভগ্নাংশ এবং দীর্ঘ বিভাজনঃ

অসীম দশমিক যে সসীম দশমিকেরই একটিপরিবর্ধিত রূপ তার কারণ হল ভগ্নাংশে প্রকাশ। দীর্ঘ বিভাজন ব্যবহার করে $1\div3$ এর মতো অতি সরল পূর্ণ সাংখ্যিক বিভজনকেও পুনরাবৃত্তিক ভগ্নাংশে পরিণত করা যায়, যাতে অঙ্কগুলো অসীম পর্যন্ত পুনরাবৃত্ত হয়। এই দশমিক ০.৯৯৯%=১ এর একটি দ্রুততর প্রমাণ প্রদান করে। ৩ কে ৩ দিয়ে গুণ করলে প্রতিটি অঙ্ক ৯ হয়, তাই ৩ × ০.৩৩৩% সমান ০.৯৯৯%। আবার ৩ × ১ ÷ ৩ সমান ১, তাই ০.৯৯৯... = ১

এ প্রমাণের আরেকটি রূপে ভগ্নাংশ ১ ÷ ৯ = ০.১১১... কে ৯ দ্বারা গুণ করা হয় ।

০.৩৩৩৩.... = ১ ÷ ৩

৩ × ০.৩৩৩৩.... = ৩ (১÷৩)

০.৯৯৯৯.... = ১

মার্জেন মৌলিক

মার্জেন মৌলিকঃ

মার্জেন মৌলিক (ইংরেজি Mersenne prime) হল সেই সব মৌলিক সংখ্যা, যারা 2 এর একটি মৌলিক সংখ্যা বিশিষ্ট ঘাত অপেক্ষা 1 কম।
যেমন:
31 (একটি মৌলিক সংখ্যা) = 32-1 = 25-1, এবং 5 হচ্ছে একটি মৌলিক সংখ্যা, সুতরাং 31 একটি মের্সেন মৌলিক সংখ্যা। কিন্তু 2047 = 211-1 মের্সেন মৌলিক সংখ্যা নয়, যদিও 11 একটি মৌলিক সংখ্যা। কারণ হচ্ছে, 2047 কোনো মৌলিক সংখ্যা নয় (2047, 89 এবং 23 দ্বারা বিভাজ্য)।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, মের্সেন সংখ্যা (মের্সেন মৌলিক সংখ্যা নাও হতে পারে!) হচ্ছে সেই সব সংখ্যা, যারা 2 এর মৌলিক ঘাত অপেক্ষা 1 কম।

$$Mn = 2^n - 1$$

e এর চমক

e একটি ধ্রুব রাশি। চলো ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে একটি মজার গেম খেলা যাক,

(ক) প্রথমে তোমার সাইন্টেফিক ক্যালকুলেটর এ তোমার পছন্দ মত সাত অংক বিশিষ্ট একটি সংখ্যা নাও । (যেকোনো সাত ডিজিটের সংখ্যা)

(খ) এবার ঐ সংখ্যাটি ইনভার্স কর অর্থাৎ x^{-1} কর।

(গ) ইনভার্স করার পর যে সংখ্যা টি পেলে তার ওপর পাওয়ার হিসেবে ঐ সাত ডিজিটের সংখ্যা টি দাও যেটি তুমি প্রথমে নিয়েছিলে।

নিশ্চয় তোমার উত্তর ২.৭১... তাইনা ? আমি হয়তোবা আশ্চর্য হবো না যদি তোমার উত্তর নিচের সংখ্যাটির সাথে মিলে যায়

$e = 2.718281828....$

তাহলে এই রহস্যময় সংখ্যা *e* টা কি ? একটু আগে তুমি যে ক্যালকুলেশন করলে সেটা হলো $(1+n^{-1})^n$ । এটাই *e* এর মান।

Euler's Equation

এই অদ্ভুত সংখ্যা টি আবিষ্কার করেন একজন অসাধারণ গনিতবিদ Leonhard Euler । তার নাম Euler এর প্রথম অক্ষর অনুযায়ী এই ধ্রুব সংখ্যার নাম *e* রাখায় অনেক গনিতবিদ ই আপত্তি পোষণ করেন। তবে বেশিরভাগ ই সেটার সমর্থন করেছে। ইনার একটি সমীকরণ রয়েছে।

$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ এটি Euler's Equation নামে পরিচিত।

জটিল সংখ্যা

গণিতে জটিল সংখ্যা (ইংরেজি: Complex number) -কে বাস্তব সংখ্যার একটি গাণিতিক সম্প্রসারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। কাল্পনিক একক i কে বাস্তব সংখ্যাসমূহের সাথে যুক্ত করে জটিল সংখ্যা পাওয়া যায় । i কে নিচের সমীকরণের সাহায্যে সংজ্ঞায়িত করা হয়: $i^2 = -1$
প্রতিটা জটিল সংখ্যাকেই $a + ib$ আকারে লেখা যায়, যেখানে a এবং b বাস্তব সংখ্যা। a ও b -কে যথাক্রমে জটিল সংখ্যার বাস্তব অংশ এবং কাল্পনিক অংশ বলা হয়।

জটিল সংখ্যাগুলি একটি ফিল্ড তৈরি করে। এই কারণে এদের উপর যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ -এই চারটি দ্বিমিক অপারেশন প্রয়োগ করা সম্ভব । এই জটিল সংখ্যার অপারেশনগুলি বাস্তব সংখ্যার অপারেশনগুলিরই সম্প্রসারিত রূপ । তবে জটিল সংখ্যার উপর প্রয়োগ করার সময় এসব অপারেশনের আরো কিছু সুন্দর এবং কার্যকর বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় । যেমন, কিছু জটিল (কাল্পনিক) সংখ্যাকে বর্গ করে ঋণাত্মক বাস্তব সংখ্যা পাওয়া সম্ভব ।

ইতালীয় গণিতবিদ জিরোলামো কার্দানো ত্রিঘাত সমীকরণ সমাধান করতে গিয়ে প্রথম জটিল সংখ্যা আবিষ্কার করেন। তিনি এগুলিকে "কাল্পনিক" অভিধা দিয়েছিলেন । সাধারণ ত্রিঘাত সমীকরণের সমাধান প্রক্রিয়ায় অনেক মধ্যবর্তী হিসেবের সময় এমন কিছু পদ চলে আসে যেগুলোতে ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূল থাকে, এমনকি যখন মূল সমাধানে শুধু বাস্তব সংখ্যা থাকে তখনও । এই পর্যবেক্ষণ থেকেই বীজগণিতের মৌলিক উপপাদ্যের সৃষ্টি । এই উপপাদ্য অনুসারে জটিল সংখ্যার সাহায্যে এক বা একের বেশি মাত্রার যে কোন বহুপদী সমীকরণের সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব ।

জটিল সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ এবং ভাগের নিয়ম প্রথমে তৈরি করেন ইতালীয় গণিতবিদ রাফায়েল বোমবেল্লি। আইরিশ গণিতবিদ উইলিয়াম রোয়ান হ্যামিলটন জটিল সংখ্যার আরো বিমূর্ত একটি বিধিবদ্ধ রূপ দেন। তিনি জটিল

সংখ্যার তত্ত্বকে চতুষ্টির তত্ত্বে উন্নীত করেন । তড়িৎচৌম্বকত্ব, কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান, ফলিত গণিত, বিশৃঙ্খলা তত্ত্ব ছাড়াও প্রকৌশলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জটিল সংখ্যার প্রচুর ব্যবহার রয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নাম থেকেও বোঝা যায় যে সেখানে এগুলিতে অন্তর্নিহিত গাণিতিক সংগঠন হিসেবে জটিল সংখ্যার ব্যবহার রয়েছে। যেমন- জটিল বিশ্লেষণ, জটিল ম্যাট্রিক্স, জটিল বহুপদী এবং জটিল বীজগণিত।

তাহলে জটিল সংখ্যা কি?

আসলে সকল সংখ্যাই কাল্পনিক ! আমাদের অতিপরিচিত সংখ্যা 1,2,3,... -1 সবই আমাদের মনের কল্পনা ! এসব সংখ্যাকে আমরা কল্পনা করে নিয়েছি আমাদের বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য এবং পর্যবেক্ষণের সাহায্যে নিশ্চিত হয়েছি যে আদর্শ অবস্থায় আমাদের গাণিতিক সমাধান গুলো ব্যবহারিক সমস্যার সমাধান হিসেবেও কাজ করে। এ বিষয়ে মনে করা যেতে পারে যে, সব ধরনের গণিতের সূচনাই হয় কিছু 'স্বীকার্যের' উপর ভিত্তি করে। যে স্বীকার্যগুলো আমরা প্রমাণ ছাড়াই মেনে নিই (আসলে প্রমাণ সম্ভব নয়)। শুধু এই 'পর্যবেক্ষণ' থেকে যে তারা বাস্তব সমস্যার সমাধানে কার্যকরী এবং স্ববিরোধী নয় ।

আমাদের পরিচিত বাস্তব সংখ্যা গুলিকে যেমন আমরা ব্যবহার করি বীজগণিত/পাটিগণিতের সাহায্যে আমাদের বাস্তব জগৎ এর সমস্যা সমাধান এর জন্য। তেমনি আমরা জটিল সংখ্যাকেও ব্যবহার করি কোয়ান্টাম মেকানিক্স, কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান (দুইটি সম্পর্কিত, কিন্তু আলাদা বিষয়) ,কোয়ান্টাম ইলেক্ট্রো ডাইনামিক্স ছাড়াও উচ্চতর গণিত বা বিজ্ঞানের এমন হাজার ক্ষেত্রে, যেখানে গাণিতিক সমীকরণ বা রাশিগুলো আমাদের বাস্তব জগৎ এর বিভিন্ন ঘটনা, পরিমাপ, এবং রাশিমালা নির্দেশ করে।

আসলে বীজগণিত শেখার শুরুতে একজন শিক্ষার্থী যেমন প্রশ্ন করে, $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ " এই সমীকরণের বাস্তব অর্থ কি ? a এর সাথে b কে যোগ করে কি লাভ? a বা b কি কোনো সংখ্যা হতে পারে?" তেমনই জটিল সংখ্যা নাম শুনে এবং $z = a + ib$ আর $i^2 = -1$ এ ধরনের (তখন পর্যন্ত তার গাণিতিক ধারণা অনুযায়ী) প্রথাবিবিরুদ্ধ সমীকরণ দেখে এবং এদের নাম "জটিল", "অবাস্তব" এসব দেখে সে নিজেও এটাকে "অবাস্তব" ভাবতে শুরু করে। জটিল সংখ্যা শিক্ষার প্রাথমিক বাধা এটাই। অতএব, জটিল সংখ্যা ঠিক ততটাই জটিল বা কাল্পনিক বা বাস্তব যতটা জটিল বা কাল্পনিক বা বাস্তব অন্য আর সব সংখ্যা। তাই জটিল সংখ্যা, কাল্পনিক অংশ এসব নাম কে শাব্দিক অর্থে না নিয়ে জটিল সংখ্যা সম্পর্কে যে সঠিক চিত্রটা আমরা পেতে পারি তা হোল

জটিল সংখ্যাও আরেক ধরনের সংখ্যা, যেটা আর সব সংখ্যার মতোই, শুধু তাদের হিসাবের নিয়ম একটু আলাদা। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য জটিল সংখ্যা অপরিহার্য

অর্থাৎ, জটিল সংখ্যা অবাস্তব সংখ্যা নয়।(আক্ষরিক অর্থে)

অমুলদ সংখ্যা

যে বাস্তব সংখ্যাকে দুটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাতে প্রকাশ করা যায় না তাকে অমূলদ সংখ্যা বলে। অমূলদ সংখ্যাকে দশমিক-এ প্রকাশ করার চেষ্টা করলে দশমিকের পর যত ঘর অবধি-ই দেখা হবে, কোন পৌনঃপুনিকতা (recurrence) দেখা যাবেনা। শুধু দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি নয় যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতির জন্যই (যেমন দ্বিনিধানি সংখ্যা পদ্ধতি) এই কথাটি খাটবে। এটাও দেখাও যায় যে, যে কোনো সংখ্যা (k) যা সঠিক ভাবে কোনো ধনাত্মক সংখ্যার n তম ঘাত নয় তার n তম মূল অমূলদ সংখ্যা হবে। আরো দেখাও যায় যে, যে কোনো সংখ্যা যা সঠিক ভাবে কোনো মূলদ সংখ্যার n তম ঘাত নয় তার n তম মূল অমূলদ সংখ্যা হবে।
কয়েকটি অমূলদ সংখ্যার উদাহরণ হল: $\sqrt{2}, \pi$, g ইত্যাদি

ইতিহাসঃ

প্রচীন গ্রিসে পিথাগোরাস সম্পর্কিত অমুলদ সংখার ইতিহাসটি বেশ রোমাঞ্চকর । হিপ্পসাস নামক পিথাগোরাসের শিষ্য √২ আবিস্কার করেন । হিপ্পসাস পিথাগোরাসের সদ্য আবিস্কৃত সমকোণী ত্রিভুজের সূত্র ব্যবহার করে, দুই বাহুর দৈর্ঘ্য ১ একক ধরে, অতিভুজ বের করতে গিয়ে একটা গোল বাধিয়ে ফেলেন । তিনি কিছুতেই অতিভুজ হিসাবে যে √২ পেয়েছেন তার মান আর হিসাব করতে পারছিলেন না । পরে বুঝলেন যে, এটা আর সব অন্য মুলদ সংখ্যার মত নয়, যাদের দুইটি পুর্ণ সংখ্যার ভাগফল আকারে লেখা সম্ভব। পরবর্তিতে আরো এরকম সংখ্যা আবিস্কৃত হয় । আর গণিতবিদেরা এদের নাম দেন অমুলদ সংখ্যা। শ্রীনিবাস রামানুজন বলেছিলেন যে √২ এর মান যতো খুশি ততো ঘর। অতি সুপরিচিত একটি অমুলদ সংখ্যা হচ্ছে অভিকর্ষজ ত্বরণ,

$$g = ৯.৮৩২১৭... \text{ ms}^{-2}$$

বিস্ময়কর মৌলিক সংখ্যা

মৌলিক সংখ্যা এবং তাদের ধর্ম যুগ যুগ ধরে সকল গণিতবিদ এবং গণিতে শিক্ষানবিশদের চমৎকৃত করে আসছে । এমনি মজার একটি ধর্মবিশিষ্ট মৌলিক সংখ্যা হল পারমুটেবল প্রাইম । একটি বিশেষ মৌলিক সংখ্যা নেয়া যাক যেমন ধরি, '৩৩৭'

এখন সংখ্যাটির অংকগুলিকে নিয়ে ইচ্ছামতো সাজাই।

যেহুতু ৩৩৭ একটি তিন অংকবিশিষ্ট সংখ্যা এবং তার মাঝে দুটি অংক একি ৩ , তাই অংকগুলিকে নিয়ে ইচ্ছামতো সাজালে আরও দুটি সংখ্যা পাওয়া যাবে। এগুলো হল ৭৩৩ এবং ৩৭৩।

মজার বিষয় হল প্রাপ্ত এই দুটি সংখ্যাও মৌলিক সংখ্যা।

এ ধরনের সংখ্যাকে বলা হয় পারমুটেবল প্রাইম অর্থাৎ, পারমুটেবল প্রাইম এমন মৌলিক সংখ্যা যার সংখ্যাগুলোকে নিয়ে যেকোনো বিন্যাসে সাজালে পুনরায় মৌলিক সংখ্যা পাওয়া যায়।

অপরদিকে, সার্কুলার প্রাইম একটি বিশেষ ধরনের পারমুটেবল প্রাইম। যদি কোন মৌলিক সংখ্যাকে বৃত্তাকার ভাবে সাজানো হয় এবং প্রাপ্ত নতুন সংখ্যাগুলোও মৌলিক হয় তাহলে সংখ্যাগুলোকে সার্কুলার প্রাইম বলা হয়।

আরেকটু খোলসা করে বললে, সার্কুলার প্রাইম এমন একটি মৌলিক সংখ্যা যার প্রথম সংখ্যাটিকে সরিয়ে নিয়ে এর শেষে সংযোজন করলে পুনরায় আরেকটি মৌলিক সংখ্যা পাওয়া যায়। পুনরায়, প্রথম অংকটিকে নিয়ে শেষে সংযোজন করলে আরেকটি মৌলিক সংখ্যা পাওয়া যায়। শুরুর সংখ্যাটি পুনরায় না আশা পর্যন্ত, এভাবে বৃত্তীয় ভাবে বারবার প্রথম অংকটিকে নিয়ে শেষে সংযোজন করে যেই সংখ্যাগুলো পাওয়া যায় সেগুলো মৌলিক সংখ্যা হবে।

এখানে, সার্কুলার প্রাইম এর ক্ষেত্রে বৃত্তীয় ক্রমটি সংরক্ষণ করতে হয়, যেখানে পারমুটেবল প্রাইম যেকোনো বিন্যাসে সাজানো যায়। অর্থাৎ, প্রতিটি পারমুটেবল প্রাইম একটি সার্কুলার প্রাইম কিন্তু প্রতিটি সার্কুলার প্রাইম,

পারমুটেবল প্রাইম নয়। উধাহরনস্বরূপ, '৩৩৭' সংখ্যাটিকে নেয়া যাক। বৃত্তীয় ক্রম সংরক্ষণ করে একে সাজালে পাওয়া যায় যথাক্রমে, ৩৭৩ এবং ৭৩৩। প্রাপ্ত সংখ্যাদুটিও মৌলিক,তাই এটি একটি সার্কুলার প্রাইম। এখানে, ৩৩৭ একি সাথে সার্কুলার প্রাইম এবং পারমুটেবল প্রাইম। সেক্ষেত্রে বুঝার সুবিধার্তে আরেকটি মৌলিক সংখ্যা নেয়া যাক যা সুধুমাত্র সার্কুলার প্রাইম। যেমন, '১৯৯৩৭' ।

বৃত্তীয় ক্রম পরিবর্তন না করে সাজালে আরও চারটি সংখ্যা পাওয়া যায় যথাক্রমে – ৯৯৩৭১, ৯৩৭১৯, ৩৭১৯৯, ৭১৯৯৩ । এই প্রাপ্ত নতুন সংখ্যাগুলোর সবগুলোই মৌলিক সংখ্যা। কিন্তু এই সংখ্যাটিকে অন্য যেকোনো বিন্যাসে সাজালে যৌগিক সংখ্যা পাওয়া যায় যেমন, '৯১৯৩৭' যা কিনা ৮৯ এবং ১০৩৩ দ্বারা বিভাজ্য। এ দ্বারা প্রমানিত হয় যে, '১৯৯৩৭' একটি সার্কুলার প্রাইম হলেও পারমুটেবল প্রাইম নয়। জার্মান গণিতবিদ H.E.Richert [১৯২৪-১৯৯৩] সর্বপ্রথম পারমুটেবল প্রাইম নিয়ে গবেষণা করেন বলে ধারণা করা হয়। এদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, দুই বা ততোধিক অংকবিশিষ্ট পারমুটেবল প্রাইম এবং সার্কুলার প্রাইম কখনই ০,২,৪,৫,৬ এবং ৮ দ্বারা গঠিত নয়, অর্থাৎ তা অবশ্যই ১,৩,৭ এবং ৯ এই সংখ্যাগুলো নিয়ে গঠিত হবে। কারন, বৃত্তীয় অথবা অবৃত্তীয় ভাবে বিন্যাস করলে তা যেন ২ অথবা ৫ দ্বারা বিভাজ্য না হয়।

ট্রানকেটেবল প্রাইম

আমরা সবাই প্রাইম নাম্বার তথা মৌলিক সংখ্যা ধারণার সাথে পরিচিত। বিভিন্ন সময় অনেক গণিতবিদ মৌলিক সংখ্যা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যধর্মী মৌলিক সংখ্যার ধারণা পেয়েছেন। আবিষ্কার করেছেন মজার মজার সব ধারা। এমনি একধরনের মৌলিক সংখ্যা হল ট্রানকেটেবল প্রাইম (Truncatable Prime) ।

ট্রানকেটেবল প্রাইম এমন একটি মৌলিক সংখ্যা যেখানে যেকোনো স্থানীয় অংকে শূন্য অনুপস্থিত থাকবে এবং যেকোনো একপাশ হতে একটি করে অংক সরিয়ে নিলে যেই নতুন সংখ্যাটি উপস্থিত হবে তা আরেকটি মৌলিক সংখ্যা হবে। পুনরায় একি পাশ থেকে আরেকটি অংক সরিয়ে নিলে আরেকটি মৌলিক সংখ্যা পাওয়া যাবে। ক্রমান্বয়ে শেষ পর্যন্ত এক অংক বিশিষ্ট মৌলিক সংখ্যা পাওয়া যাবে। ট্রানকেটেবল প্রাইম দুই ধরনের।

১। Left Truncatable Prime
২। Right Truncatable Prime

কোন ট্রানকেটেবল প্রাইম সংখ্যার একটি একটি করে অংক বাম দিক থেকে সরিয়ে নিয়ে পুনরায় মৌলিক সংখ্যা পাওয়া গেলে, সেই সংখ্যাটি হল লেফট ট্রানকেটেবল প্রাইম। একইভাবে, কোন ট্রানকেটেবল প্রাইম সংখ্যার একটি একটি করে অংক ডান দিক থেকে সরিয়ে নিয়ে পুনরায় মৌলিক সংখ্যা পাওয়া গেলে, সেই সংখ্যাটি হল রাইট ট্রানকেটেবল প্রাইম। আসলে বিষয়টি খুব মজার। উধাহরনস্বরূপ, ৭৩৯৩৯১৩৩ একটি রাইট ট্রানকেটেবল মৌলিক সংখ্যা। ৭৩৯৩৯১৩৩ এর শেষের অংক ৩ বাদ দিলে নতুন সংখ্যা পাওয়া যায় তা হল ৭৩৯৩৯১৩ । ৭৩৯৩৯১, ৭৩৯৩৯, ৭৩৯৩, ৭৩৯, ৭৩; ৭ এরা সবাই এক একটি মৌলিক সংখ্যা ।

৭৩৯৩৯১৩৩
৭৩৯৩৯১৩
৭৩৯৩৯১
৭৩৯৩৯
৭৩৯৩
৭৩৯
৭৩
৭

১০ সংখ্যাভিত্তিক গণনা পদ্ধতিতে সর্বমোট রাইট ট্রানকেটেবল মৌলিক সংখ্যা ৮৩ টি । মজার ব্যাপার হল তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটিই হল ৭৩৯৩৯১৩৩।

অনুরুপ একটি ট্রানকেটেবল মৌলিক সংখ্যা হল -

৩৫৭৬৮৬৩১২৬৪৬২১৬৫৬৭৬২৯১৩৭

যা কিনা সর্ববৃহৎ লেফট ট্রানকেটেবল মৌলিক সংখ্যা যেখানে ট্রানকেটেবল মৌলিক সংখ্যা মোট ৪২৬০ টি

লেফট অথবা রাইট ট্রানকেটেবল প্রাইম এর সংখ্যা সীমিত । যা হল যথাক্রমে ৪২৬০ এবং ৮৩ । কিন্তু, এখানে প্রথমেই বলা আছে যে ট্রানকেটেবল মৌলিক সংখ্যার মধ্যে কোথাও কোন শূন্য থাকতে পারবে না । এখন যদি শূন্য আছে এমন মৌলিক সংখ্যা নিয়ে চিন্তা করা হয় তাহলে ট্রানকেটেবল মৌলিক সংখ্যার একটি অসীম ধারা পাওয়া যাবে ।

টু সাইডেড প্রাইম সংখ্যা

একটি বিশেষ ধরনের প্রাইম নাম্বার আছে যা একি সাথে লেফট ট্রানকেটেবল প্রাইম এবং রাইট ট্রানকেটেবল প্রাইম এর বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। এটি হল টু-সাইডেড প্রাইম [Two-sided Prime] যে সকল মৌলিক সংখ্যা একি সাথে লেফট-ট্রানকেটেবল এবং রাইট-ট্রানকেটেবল, সে সকল সংখ্যাকে বলা হয় টু-সাইডেড প্রাইম।

সাধারণত, যেকোনো একপাশ হতে একটি করে অংক সরিয়ে নিতে থাকলে ক্রমান্বয়ে যেই নতুন সংখ্যাগুলো উপস্থিত হতে থাকবে তারাও মৌলিক সংখ্যা হবে। আমরা জানি ডান পাশ থেকে সরালে রাইট ট্রানকেটেবল ও বাম পাশ থেকে সরালে লেফট ট্রানকেটেবল প্রাইম হয়। কিন্তু যেই সংখ্যাটির উভয় পাশে এই বৈশিষ্ট্য ধারণ করে তাই হল টু-সাইডেড প্রাইম।
এই সংখ্যাগুলোর ক্ষেত্রে যেকোনো একপাশ থেকে শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা পাওয়া যায়।
উধাহরন হিসেবে এরকম একটি টু-সাইডেড প্রাইম ' ৭৩৯৩৯৭ ' নেয়া যাক।

প্রথমে যদি বাম পাশ থেকে শুরু করা যায় তাহলে আমরা যেই মৌলিক সংখ্যাগুলো পাই-

৭৩৯৩৯৭
৩৯৩৯৭
৯৩৯৭
৩৯৭
৯৭
৭

ঠিক একই ভাবে ‘ ৭৩৯৩৯৭ ‘ সংখ্যাটিকে যদি ডান দিক একটি একটি করে অংক বাদ দিয়ে দেয়া হয়-

৭৩৯৩৯৭
৭৩৯৩৯
৭৩৯৩
৭৩৯
৭৩
৭

মজার ব্যাপার হল এরকম টু-সাইডেড প্রাইমের সংখ্যা সীমিত। ১০ সংখ্যাভিত্তিক গণনা পদ্ধতিতে সর্বমোট টু-সাইডেড প্রাইম সংখ্যা ১৫ টি। এবং এদের মাঝে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটিই হল ৭৩৯৩৯৭ ।

গণিতের কালপঞ্জি

১. আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০,০০০ অব্দ
প্রাচীন জ্যামিতিক ডিজাইনের ব্যবহার।

২. আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দ
মিশরে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার।

৩. আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দ
ব্যাবিলন ও মিশরে পঞ্জিকার ব্যবহার।

৪. আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৪০০ অব্দ
মিশরে প্রথম সংখ্যাসমূহের প্রতীক হিসেবে সরলরেখার ব্যবহার।

৫. আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ
মধ্যপ্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরের আশেপাশের এলাকায় অ্যাবাকাসের উদ্ভাবন ও প্রচলন।

৬. আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ
মিশরে হায়ারোগ্লিফীয় সংখ্যার ব্যবহার।
ব্যাবিলনবাসীরা ব্যবসায়িক হিসাবে রাখার জন্য ষাট-ভিত্তিক সংখ্যা ব্যবস্থা ব্যবহার করা শুরু করে। স্থানীয় মানের ধারণা ব্যবহারকারী এই সংখ্যা ব্যবস্থায় শূন্য বলে কোন স্থানীয় মান ছিল না।

৭. আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৭৭০ অব্দ
মিশরীয় পঞ্জিকার ব্যবহার।

৮. আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দ
হরপ্পাবাসীরা ওজন ও পরিমাপের জন্য একটি সুষম দশমিক সংখ্যা ব্যবস্থা ব্যবহার করত।

৯. আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৯৫০ অব্দ
ব্যাবিলনবাসীরা দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধান করে।

১০. আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৯০০ অব্দ
মস্কো প্যাপিরাস (গোলেনিশেভ প্যাপিরাস) লিখিত হয়। এতে মিশরীয় জ্যামিতির বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়।

১১. আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৮৫০ অব্দ

ব্যাবিলনবাসীরা পিথাগোরাসের উপপাদ্য সম্পর্কে অবহিত ছিল।

১২. আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দ
ব্যাবিলবাসীরা গুণনের নামতা ব্যবহার করত।

১৩. আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫০ অব্দ
ব্যাবিলনবাসীরা রৈখিক ও দ্বিঘাত বীজগাণিতিক সমীকরণ সমাধান করে এবং বর্গমূল ও ঘনমূলের সারণি প্রস্তুত করে। তারা পিথাগোরাসের উপপাদ্য ব্যবহার করত এবং জ্যোতির্বিদ্যামূলক জ্ঞানের প্রসারে গণিতের সাহায্য নিত।

১৪. আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ অব্দ
রাইন্ড প্যাপিরাস এই সময় লিখিত হয়। এই প্যাপিরাস থেকে বোঝা যায় মিশরীয় গণিতবিদেরা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের বহু কৌশল বের করেছিল। বারবার দুই দিয়ে গুণ করে গুণন আর বারবার অর্ধেক করে বিভাজন সম্পন্ন হত।

১৫. আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ অব্দ
চীনে শূন্য ছাড়াই একটি দশমিক সংখ্যা ব্যবস্থার প্রচলন ।

১৬. আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দ
বৌদ্ধয়ন প্রাচীনতম ভারতীয় শুল্বসূত্রগুলির একটি রচনা করেন।

১৭. আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৭৫০ অব্দ
মানব একটি শুল্বসূত্র রচনা করেন ।

১৮. আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ
অপস্তম্ব গাণিতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক শুল্বসূত্র রচনা করেন ।

১৯. খ্রিস্টপূর্ব ৫৭৫ অব্দ
থালেস ব্যাবিলনীয় গাণিতিক জ্ঞান গ্রিসে নিয়ে আসেন । তিনি জ্যামিতির সাহায্যে পিরামিডের উচ্চতা ও তীর থেকে জাহাজের দূরত্ব নির্ণয়ের সমস্যা সমাধান করেন ।

১০ জন গনিতবিদ

১. মাইলেটাসের থেলিস

জন্মঃ

আনুমানিক ৬২৪ খ্রিস্টপূর্বে, এশিয়ার মাইনরের(তুরস্ক) মিলেটাস নামক জায়গায়।

মৃত্যুঃ

আনুমানিক ৫৪৭ -৫৪৬ খ্রিস্টপূর্বে।

পরিচিতিঃ

গ্রিক গণীতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ এবং দার্শনিক। তাঁকে গ্রিক বিজ্ঞান, গণিত ও দর্শনের স্থপতি বলা হয় ।

অবদানঃ

তিনিই প্রথম চিন্তা করেন জ্যামিতি দিয়ে অনেক জটিল বিষয়ের সমাধান করা সম্ভব। তিনি সমকোণী ত্রিভুজের সাহায্যে পিরামিডের উচ্চতা বের করে দিয়ে মিশরীয়দের চমকিয়ে দেন, যা পরবর্তীতে ত্রিকোণমিতির উন্নতিতে অনেক অবদান রেখেছিল। তিনি জ্যামিতির কিছু যুগান্তকারী উপপাদ্যের জনক।

২. পিথাগোরাস

জন্মঃ

আনুমানিক ৫৭০ খ্রিস্টপূর্বে; তুরস্কের উপকূলবর্তী এজিয়ান সাগরের সামোস নামক একটি দ্বীপে ।

মৃত্যুঃ

আনুমানিক ৪৯৫ খ্রিস্টপূর্বে; দক্ষিণ ইতালির মেতাপোন্তাম নামক জায়গায়।

পরিচিতিঃ

গ্রিক দার্শনিক ও গণিতবিদ।

অবদানঃ

তিনি গণিতশাস্ত্রে বিশেষ করে – ত্রিমাত্রিক ও ক্ষেত্রফল সম্বন্ধীয় জ্যামিতিশাস্ত্র এবং সংখ্যাতত্ত্বে বিশেষ অবদান রাখেন। তোমাদের পাঠ্যবইয়ের বিখ্যাত ” পিথাগোরাসের সূত্রটি তাঁরই আবিস্কার। আর হ্যাঁ, তিনিই প্রথম জ্যোতির্বিদ কোপার্নিকাসকে ইঙ্গিত প্রদান করেন যে, সূর্যই সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু।

৩. ইউক্লিড

জন্মঃ

আনুমানিক ৩২৫ খ্রিস্টপূর্বে; মিশরের আলেকজান্ড্রিয়াতে ।

মৃত্যুঃ

আনুমানিক ২৬৫ খ্রিস্টপূর্বে; মিশরের আলেকজান্ড্রিয়াতে।

পরিচিতিঃ

তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রিক গণিতবিদ । ইউক্লিডকে জ্যামিতির জনক (Father of Geometry) বলা হয় ।

অবদানঃ

তাঁর রচিত ১৩ খন্ডের The Elements বইটি সাধারণ জ্যামিতির ভিত্তি স্থাপন করে। বইটি প্রায় ২০০০ বছর যাবৎ ইউরোপের সকল উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠ্যবই হিসেবে নির্ধারিত ছিল। তাঁর লেখা অন্যান্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে – Data, Catoptrics ইত্যাদি। জ্যামিতি ছাড়াও তিনি আলোকবিদ্যার (Optics) উপরে কিছু গণিত কর্ম সম্পাদন করেন ।

৪. আর্কিমিডিস

জন্মঃ

২৮৭ খ্রিস্টপূর্ব; সিরাকিউস, সিসিলিস (ইতালি)

মৃত্যুঃ

২১২ খ্রিস্টপূর্ব; সিরাকিউস, সিসিলিস (ইতালি)

পরিচিতিঃ

গ্রিক গণিতবিদ, পদার্থবিদ, প্রকৌশলী, আবিস্কারক এবং জ্যোতির্বিদ। প্রাচীন যুগের সেরা এবং সর্বকালের শ্রেষ্ঠ তিন গণিতবিদদের একজন।

অবদানঃ

তাঁর উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারগুলোর মধ্যে রয়েছে- আর্কিমিডিসের সূত্র, প্লবতা নীতি, লিভার নীতি, তরল স্থিতিবিদ্যার (Hydrostatics) প্রথম নীতি, পাই (π) -এর মান নির্ণয় ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি স্থিতিবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ভারকেন্দ্র ধারণার বিকাশ সাধন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে-

On Floating Bodies, On the Equilibrium of Planes ইত্যাদি।

৫. আর্যভট্ট

জন্মঃ

৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ; পাটনা, ভারত ।

মৃত্যুঃ

৫৫০ খ্রিস্টাব্দ; ভারত ।

পরিচিতিঃ

প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত গণিতবিদদের একজন।

অবদানঃ

প্রাচীন ভারতীয় গণিতের ইতিহাস তাঁর হাত ধরেই ক্লাসিক্যাল যুগ কিংবা স্বর্ণযুগ শুরু হয়। তিনি গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তাঁর এ বিষয়ক কাজগুলো মূলত Aryabhatiya (মাত্র ২৩ বছর বয়সে রচিত, ৪ খন্ড) এবং Arya-siddhanta গ্রন্থে প্রকাশ করেন । তিনি পাই (π) প্রকৃত আসন্ন মান (৩.১৪১৬) প্রদান করেন। আধুনিক ত্রিকোণমিতির সূত্রপাত তিনিই করেন।

৬. ব্রহ্মগুপ্ত

জন্মঃ

৫৯৮ খ্রিষ্টাব্দে; জালোর, রাজস্থান, ভারত।

মৃত্যুঃ

৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দ; ভারত।

পরিচিতিঃ

প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

অবদানঃ

তিনিই প্রথম গণনায় শূন্য ব্যবহারের নিয়ম প্রচলন করেন এবং প্রথম পাটিগণিত এবং বীজগণিতি দুইটি পৃথক বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার উপর তাঁর দুইটি কর্ম হল- Brahmsphuta-siddhanta এবং khandakhadyaka. আরব বিশ্ব ভারতের জ্যোতির্বিদ্যার সাথে প্রথম পরিচিত হয় এই "ব্রহ্মস্ফুট সিদ্বান্ত" – এর মাধ্যমে।

৭. আল খোয়ারিজমি

জন্মঃ

আনুমানিক ৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে; ইরাকের বাগদাদে।

মৃত্যুঃ

আনুমানিক ৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে; বাগদাদ, ইরাক।

পরিচিতিঃ

বীজগণিতের জনক। আরব গণিতবিদ, ভূগোলবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও দার্শনিক ।

অবদানঃ

বীজগণিত, পাটিগণিত, ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে । তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান হল- "হিসাব আল জাবর ওয়াল মুকাবেলা" নামক বইটি, যা বিশ্বে এযাবৎ বীজগণিতের উপর সবচেয়ে প্রভাবশালী বই। এ বইটিতে বীজগণিতের বহু বিষয় গুছিয়ে লেখা হয়েছে ।

৮. ওমর খৈয়াম

জন্মঃ

১৮ মে, ১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দে; নিশাপুর, ইরাক।

মৃত্যুঃ

৪ ডিসেম্বর, ১১৩১ খ্রিষ্টাব্দে; নিশাপুর, ইরাক।

পরিচিতিঃ

বিখ্যাত গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ, দার্শনিক ও কবি।

অবদানঃ

তাঁর সবচেয়ে বড় উদ্ভাবন “Analytical Geometry” এবং “Binomial Theorem”, যার প্রথমটিকে ফরাসী গণিতবিদ রেনে ডেকার্ত পূর্ণ অবয়ব দিয়ে অমরত্ব লাভ করেন এবং দ্বিতীয়টির উদ্ভাবক হিসেবে নিউটন জগতে বরেণ্য হন। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো - “Explanation of the Difficulties in the postulates of Euclid” যাতে তিনি জ্যামিতির ভিত্তি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দুইটি বিষয় পর্যালোচনা করেন ।

৯. জন নেপিয়ার

জন্মঃ

১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দে; এডিনবার্গ, স্কটল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ।

মৃত্যুঃ

৪ এপ্রিল, ১৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে; এডিনবার্গ, স্কটল্যান্ড ।

পরিচিতিঃ

স্কটিস গণিতবিদ। তিনি মাত্র ১৩ বছর বয়সে স্কটল্যান্ডের University of St. Andrews -তে প্রবেশ করেন।

অবদানঃ

তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান হলো- লগারিদম আবিস্কার, যা “Canonis Descriptio” গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। নেপিয়ারই ছিলেন সম্ভবত প্রথম গণিতবিদ যিনি সফলভাবে এবং সুশৃঙ্খলভাবে দশমিক বিন্দুর ব্যবহার শুরু করেন। তিনি জ্যামিতি শাস্ত্রে এবং Spherical Trigonometry- তে বিশেষ করে গোলীয় (Spherical) সমকোনী ত্রিভুজ অনুশীলনেও বিশেষ অবদান রাখেন ।

১০. রেনে ডেকার্ত

জন্মঃ

৩১ মার্চ, ১৫৯৬ খ্রিষ্টাব্দ; লা হায়ে এন টোরেইন, ফ্রান্স।

মৃত্যুঃ

ফেব্রুয়ারী, ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ; স্টকহোম, সুইডেন।

পরিচিতিঃ

গাণিতিক দর্শনের জনক। স্থানাংক জ্যামিতি ও বিশ্লেষণ জ্যামিতিরো জনক। তাঁকে আরও বলা যায় – ফরাসী দার্শনিক ও গণিতবিদ এবং আধুনিক গণিতের অগ্রপথিক ।

অবদানঃ

তিনি জ্যামিতিতে বীজগণিত ব্যবহার করে গণিতে নতুন শাখারুপে "এনালাইটিকেল জিওমেট্রি" চালু করেন । তিনিই প্রথম গণিতবিদ, যিনি অজানা সংখ্যাকে বর্ণ বা অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করেন এবং $x \times x$ এর পরিবর্তে x^2 লেখার প্রচলন করেন ।

---|---

শাহরিয়ার কবির

জন্ম সাল ঃ ১৯-১১-২০০
ঠিকানা ঃ বানেশ্বর, পুঠিয়া, রাজশাহী

মা-বাবা আর এক ছোটবোন নিয়ে তার পরিবার। বর্তমানে তিনি বানেশ্বর সরকারী কলেজের ইন্টার প্রথম বর্ষের ছাত্র। লেখালিখি করেন ২০১৬ সাল থেকে। তার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় মাসিক "কিশের কণ্ঠ" পত্রিকায়। এছাড়াও "দুড়ন্ত শিশু-কিশোর" পত্রিকায় তার একাধিক লেখা প্রকাশিত হয়। গণিতে আগ্রহী হন তার হাই স্কুলের শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন স্যারের কাছ থেকে। বিজ্ঞান বিভাগে পড়ছেন বলে বিজ্ঞান জানার আগ্রহ বেশি। এছাড়াও তিনি

`Heroes of 71',"মুক্তিক্যাম্প" সহ ইউনিসেফের ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি "বাংলাদেশ জেনারেশন পর্লামেন্ট"-এর সদস্য এবং রাজশাহী-৫ আসনের "প্রজন্ম সংসদ সদস্য" হিসেবে কাজ করছেন।

গণিতাঙ্ক

ওয়েমার্ক ই-পাবলিকেশন